সুকুমার দে সরকার
বি-এস-সি

নাথ ব্রাদার্স
২৩-সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স
-সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৪৩

আট আনা]

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা

সেই সব ছেলে-মেয়েদের হাতে, যারা জ্ঞানের জন্য বিপদকে বরণ করতে ভয় পাবে না কোনদিন—

ম্যাক্‌মিলানের বন্দুক গর্জে চলেছে·

—পৃষ্ঠা ৩৯

অজ্ঞাত-রাজ্য

যুগ-যুগান্তর ধরে পৃথিবীর দুই মেরু-প্রদেশ মানুষের মনে অনন্ত বিস্ময় জাগিয়ে এসেছে। ধূ-ধূ-ধূ অন্তহীন সাদা বরফের হিম-কঠোর-রাজ্য মাসের পর মাস ধরে একটানা দিন, আবার মাসের পর মাস কালো আধার রাত, যে দিকে চাও অনন্ত কালো শূন্যতা, কোনও পরিচিত কিছু নেই শুধু আকাশে জ্বলজ্বলে ধ্রুবতারা রোজ তোমার দিকে চেয়ে মৃত্যুম্লান হাসি হাসবে। কোথাও বা আবার—যখন দিনের পর দিন কালো অন্ধকার তোমার মনে চেপে বসছে, একটু একটু করে জমানো খাদ্য শেষ হয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে মরণ পল-পল করে—হঠাৎ

আঁধারের বুক চিরে দেখা দেবে অপরূপ বিস্ময়কর ছটা, সাত রঙের খেলা—অরোরা বোরিয়ালিস্, অরোরা অষ্ট্রেলিস্। একটু একটু করে আবার আশা জাগবে মনে তারপরে হঠাৎ একদিন আকাশ যেখানে বরফের প্রান্তদেশে দূর বহুদূরে মিলিয়ে গেছে, সেখানে দেখা দেবে অস্পষ্ট এক আলোক রেখা। এসেছে—এসেছে সূর্য্য, এসেছে উত্তাপ, এসেছে জীবন—তারপরে আবার সেই একটানা দিন, সাদা বরফের মরুভূমির ওপর রাত্রিহীন অনন্ত দিন।

এমনি ত বরফের মেরু-রাজ্য! তার জীব জগৎও কত বিস্ময়কর সীল মাছ, সাদা ভালুক, কস্তুরী গাই, সিন্ধু ঘোটক পেঙ্গুইন্ পাখীর-সার আর সমুদ্রে বিরাটকায় তিমি, যুগ যুগ ধরে এই হিমের দেশে বাস করে এসেছে। যেখানে আকাশ-ছোঁয়া প্রকাণ্ড বরফের পাহাড়, প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে মানুষের আগমনে বাধা জানাচ্ছে, যেখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও জল তরল দেখা যায় না—সেখানে সেই অনধিগম্য হিমের দেশও মানুষকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তিল-তিল করে প্রাণ দিয়েও মানুষ তাকে জয় করেছে। অনেক প্রাণের মায়া ছাড়া বেপরোয়া লোকের বহু শতাব্দীব্যাপী পরিশ্রমের পর মানুষ পৃথিবীর এই রহস্যময় অংশটুকু আবিষ্কার করেছে।

আজকাল আমরা পৃথিবীর যে কোন স্থান, যে কোন দ্বীপ, যে কোন সমুদ্র অনায়াসে ম্যাপ দেখে বলে দিতে পারি যে, এটা এখানে আছে এতদূরে, এই তার অবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু পৃথিবীর এই ম্যাপ ত এত সহজে হয়নি। একটু একটু করে পৃথিবীর নানা দেশের লোক

অশেষ পরিশ্রমের পর পৃথিবীর সম্বন্ধে আমাদের এই জ্ঞানার্জ্জনে সহায়তা করেছে। এমন একদিন ছিল যখন লোকেরা নিজের নিজের দেশটুকুকেই ভাবত বুঝি পৃথিবী, তারপরে আবিষ্কৃত হোল নৌকো, জাহাজ ; ধীরে ধীরে মানুষ নদী সমুদ্র পাড়ি দিলে, ধীরে ধীরে তারা জানতে লাগল যে তাদের দেশের বাইরে আরও দেশ আছে সেখানেও বাস করে ওদেরই মত মানুষ কিন্তু দেশভেদে হয়ত তাদের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার বিভিন্ন। অনুসন্ধিৎসু মানুষের কৌতূহল বেড়ে গেল তারা খুঁজে বেড়াতে লাগল পৃথিবীর আরও বিচিত্রতা, আরও বিস্ময়! ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যের বিস্তার হতে লাগল। এক দেশের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসমূহ অন্য দেশ থেকে আনা হতে লাগল। এই রকম করেও নূতন দেশ জানবার স্পৃহা লোকের বেড়ে যেতে লাগল। কার্য্যকরী জ্ঞানস্পৃহা ক্রমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে এসে দাঁড়াল। জ্ঞানলোভী মানুষ অনুভব করলে পৃথিবীর কোন অংশই তার অজানা থাকা উচিত নয়। পৃথিবীর রহস্য তারা ভেদ করতে কোমর বেঁধে লেগে গেল।

চৈনিক সভ্যতা, মিশরীয়, ভারতীয়, গ্রীক্, রোমক সভ্যতা শেষ হয়ে গেল। কত সাম্রাজ্য গড়ল, ভেঙ্গে গেল। তখনও পৃথিবী সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয়নি। পৃথিবীর ম্যাপ বলে আমরা যে ছবি এখন দেখি এত সম্পূর্ণ ভাবে তখনও তা লোকে জানত না। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ধীরে ধীরে ইউরোপ সভ্য হয়ে উঠল। সেখানে জন্মাতে লাগল বড় বড় বৈজ্ঞানিক, পরিব্রাজক, আবিষ্কর্ত্তা। জলে, স্থলে

মানুষের অধিগম্য সমস্ত স্থানই আবিষ্কৃত হয়ে গেল—ম্যাপ তৈরী হল। কিন্তু তখনও দুরধিগম্য দুই মেরুদেশ হিমের আড়াল দিয়ে মানুষের অগোচর হয়েই রইল। পৃথিবীর উত্তরে ও দক্ষিণে যে কি আছে জানবার জন্যে মানুষ এইবার উৎসুক হয়ে উঠল।

৬৬° ডিগ্রি ল্যাটিচিউড দিয়ে ঘেরা পৃথিবীর উত্তরাংশকে মেরু-বৃত্ত অর্থাৎ মেরু-রাজ্য বলা হয়। এইটাই উত্তর মেরু-রাজ্য। এখানে ল্যাটিচিউড্ আর লঙ্গিচিউড্ সম্বন্ধে খানিকটা বলে রাখা ভাল। পৃথিবীটা আমরা জানি গোল। পৃথিবীর উপরে কোন জায়গা সম্বন্ধে বলতে হলে আমরা কেমন করে তার ঠিকানা দিতে পারি? ধর, তুমি প্রশ্ন করলে সিলোন্‌দ্বীপটা কোথায়? তখনই হয়ত উত্তর আসবে ভারতবর্ষের নীচে কিন্তু তখন আবার প্রশ্ন হবে, ভারতবর্ষ কোথায়? এমনি করে প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া যাবে না যদি না একটা জানা জায়গা থেকে আমরা সিলোনের দূরত্বটা না বলে দিই। পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের ওপর নিজের চারদিকে ঘুরছে এখন পৃথিবীর মধ্যে দুটি জায়গা মোটে স্থির আছে অর্থাৎ এই দুটি জায়গাই শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে না। উত্তর-মেরু আর দক্ষিণ-মেরু। কারণ পৃথিবীর মেরুদণ্ডের দুই প্রান্ত হল এই দুই মেরুদেশ। এই দুটি স্থির জায়গা থেকে যে কোন স্থানের দূরত্ব মেপে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু দুটো জায়গা থেকে মাপার অসুবিধা বলে, এই দুই মেরুর থেকে সমান দূরবর্ত্তী পৃথিবীর মধ্য দিয়ে যে বিষুব রেখা (equator) গেছে সেই বিষুব রেখা থেকে সমস্ত দূরত্ব ঠিক করা হয়। যে কোন স্থান বিষুব রেখার উত্তরে বা দক্ষিণে। ম্যাপে বিষুব-

রেখার সমান্তরালবর্ত্তী যে সমস্ত গোল রেখাগুলি দেখা যায় সেই গুলিকে ল্যাটিচিউড্ বলা হয়।

এখন পৃথিবীর ওপরে একটা জায়গা বিষুব রেখার উত্তরে বা দক্ষিণে আমরা জানতে পারলাম কিন্তু তাহলেও ঠিক কোন জায়গায় জানা গেল না। বিষুব রেখার উত্তরে বা দক্ষিণে না হয় হল কিন্তু ঠিক সোজা উত্তরে না উত্তর-পূবে বা উত্তর-পশ্চিমে এটা ত জানা গেল না! অমুকের বাড়ীটা ঠিক এই দুই রাস্তার মোড়ে বলে দিলে যেমন খোঁজার সুবিধা হয় সেই রকম সুবিধা করবার জন্যে সৃষ্টি হোল লঙ্গিচিউডের। ল্যাটিচিউড কে কেটে যে সমস্ত গোল রেখগুলি ম্যাপে দেখা যায় তাকেই লঙ্গিচিউড্ বলে।

বিষুব রেখা থেকে মেরু পর্য্যন্ত ৯০টী ল্যাটিচিউড্ আছে। প্রত্যেক ল্যটিচিউডের প্রত্যেকের থেকে দূরত্ব এক ডিগ্রী। তাহলে বিষুব রেখার থেকে উত্তর মেরুর দূরত্ব ৯০ ডিগ্রী। এখন এক ল্যাটিচিউড্ থেকে আর এক ল্যাটিচিউডের দূরত্ব যে এক ডিগ্রি একেও আবার আরো ৬০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এই প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় মিনিট আবার মিনিটকেও ৬০ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় সেকেণ্ড। এক ল্যাটিচিউড্ থেকে অন্য ল্যাটিচিউড্ এই এক ডিগ্রি রাস্তাটুকু নেহাৎ কম নয় প্রায় ৬০।৬৫ মাইল তাই তার এত ভাগ—মিনিট, সেকেণ্ড।

কোন শতাব্দীতে কে প্রথমে মেরু-প্রদেশের সমুদ্রে জাহাজ চালিয়েছিল বলা যায় না। অনেক দিন আগে থেকেই লোকে আন্দাজ

করত যে পৃথিবীর উত্তর দিকে এক বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে। ইউরোপে যখন নবম শতাব্দী তখনই নরওয়ের লোকেরা মেরু-প্রদেশে অবস্থিত গ্রীণল্যাণ্ড আবিষ্কার করে এবং সেখানে বসতিও স্বুরু করে। কিন্তু তাদের এ জ্ঞান তারা জগৎকে দিয়ে যেতে পারেনি। নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে তারা গ্রীণল্যাণ্ড থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। তারপরে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেউ আর (Artic Circle) পার হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে স্পেনের প্রভাব ধনরত্ন তখন সবচেয়ে বেশী ওদিকে পর্টুগালও প্রাচ্যে বাণিজ্য বিস্তার করেছে। কলম্বাস আমেরিকা অবিষ্কার করল, ভাস্কো-ডা-গামা, কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্ ঘুরে ভারতে পৌঁছল, ম্যাগেলান্ জাহাজে করে সারা পৃথিবীটাই ঘুরে এল। ইংলণ্ড তখন সবে ঘরোয়া বিবাদ শেষ করে উঠেছে। ইংলণ্ডের বণিকেরা তখন স্পেন পর্টুগালের ধন-সম্পত্তি দেখে তারাও ধনী হয়ে উঠবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তারা ভাবলে উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে তারা আরও তাড়াতাড়ি প্রাচ্যে গিয়ে পৌঁছবে। বাণিজ্যের দিক দিয়ে এই পথের বিশেষ স্থবিধা হয়নি বটে কিন্তু এই থেকে হল মেরু-প্রদেশ আবিষ্কারের সূত্রপাত।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে মেরুপ্রদেশ বিজয়ে ইংলণ্ডই প্রথম অগ্রণী। একটু একটু করে ইংলণ্ড থেকে অনেক জাহাজই মেরুপ্রদেশের দিকে অগ্রসর হল কিন্তু মেরুপ্রদেশ যেন মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে; তার রাজ্যে সে মানুষকে ঢুকতে দেবে না। প্রথম অভিযানকারীদের মধ্যে অনেকে মারা গেল—শীতে জমে, খাদ্যের

অভাবে, রোগে। অনেকে পেছিয়ে এল। তবু ধীরে ধীরে এতদিনে অজানা মেরুদেশের ম্যাপ তৈরী হতে লাগল। ষ্টিফেন্ বারোজ, আর্থার পেট ভয়ঙ্কর কারা-সমুদ্র আবিষ্কার করলেন ও তার মধ্যে দিয়ে জাহাজ চালিয়ে এলেন। মেরু সমুদ্রে জাহাজ চালান ভয়ানক বিপদের কথা। সমুদ্রের মধ্যে আছে তুষারাবৃত বড় বড় পাহাড়। জলে বড় বড় বরফের চাঁই ভেসে বেড়াচ্ছে—হয়ত ওপরে জেগে আছে একটুখানি কিন্তু জলের নীচে হয়ত হাজার হাজার গজ লম্বা। একবার জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেই সর্ব্বনাশ! তার উপর আছে অসহ্য শীত—শীতকালে সামান্য খোলা পেলেই হাত পা জমে এমন আড়ষ্ট হয়ে যায় যে, তখন তাকে কেটে ফেলা ভিন্ন উপায় থাকে না। আরও বিপদ—বেশ জাহাজ চলেছে সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে, এল শীতকাল, সমুদ্রের তরল জল দেখতে দেখতে জমে বরফের একটা শত যোজন-ব্যাপী চাঁই হয়ে গেল। জাহাজের আর এতটুকু নড়বার সাধ্য নেই। চুদিক থেকে,—আশে প্যাশে, সামনে পিছনে বরফ এসে বন্দী করে ফেলেছে জাহাজকে। শুধু বন্দী করেই আবার ক্ষান্ত হল না। তোমরা জান জল যখন জমে বরফ হয় তখন সেটা বেড়ে যায়। ধর একটা গেলাসে চার ভাগের তিনভাগ জল তুমি ভর্ত্তি করে রাখলে, কানার দিক থেকে একটুখানি খালি রইল। জলটা জমে বরফ হলে দেখবে গেলাস ছাপিয়ে উঠেছে কানায়-কানায়। জল বরফ হলে তার জায়গা লাগে বেশী।

এদিকে জাহজত আটকে গেল—সমুদ্রের জল জমে বাড়তে স্বরু হল

—মাঝখানে জাহাজ। সেই শত যোজন ব্যাপী বরফের চাঁইয়ের এমন অসম্ভব চাপ হয় যে জাহাজ দেখতে দেখতে গুঁড়িয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। এমন করে কত জাহাজ গেছে, কত লোক প্রাণ হারিয়েছে। তবু মানুষ দমেনি—অদম্য তার জ্ঞানস্পৃহা—অদম্য তার লোভ!

প্রথম অভিযানকারীদের মধ্যে মার্টিন্ ফর্বিশার্ এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। তিনি মেরু-বৃত্ত পার হয়ে ঘুরে এলেন। এই সব প্রথম অভিযানকারীদের কাছে থেকে লোকে জানতে পারল যে মেরুপ্রদেশের প্রান্তে বরফের রাজ্যে এস্কিমো বলে একরকম তামাটে রঙের বেঁটে শক্ত কর্ম্মঠ জাত বাস করে। এই এস্কিমোরা আসলে গ্রীণল্যাণ্ডের উপরে ধারে বাস করত, কারণ গ্রীণল্যাণ্ডের মাঝখানটা খালি বরফ আর বরফের পাহাড়। ধারে গ্রীষ্মকালে সবুজ গাছপালা দেখা দিত শিকার পাওয়া যেত—দলে দলে বল্গা হরিণ চরতে আসত। জায়গাটা বাসযোগ্য ছিল। শীতকালে কিন্তু আবার বরফে সব ঢেকে যেত। তখন এস্কিমোরা বরফেরই ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর করে তার মধ্যে বাস করত। শীতকালে তারা সীলমাছ সাদা ভালুক, কস্তুরীগাই ইত্যাদি শিকার করে খাদ্য জোগাড় করত। সীলের চামড়া সাদা ভালুকের চামড়া দিয়ে এস্কিমো মেয়েরা পোষাক, জুতো, টুপী বানিয়ে দিত। রাতে ঐ সব চামড়াই হোত বরফের ওপর বিছানা।

বরফের ঘর বলে ভাবছ বুঝি কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়। মেরুরদেশের বরফ পাথরের চেয়েও শক্ত তাই দিয়ে

এস্কিমোদের সাদা ভালুক শিকার

ঘর হলে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া আটকাত। ভিতরে সীলের চর্ব্বির বাতী জ্বালিয়ে আগুন করে লোকগুলো বেশ আরামেই কাটিয়ে দিত। পিয়েরী যখন উত্তর-মেরু জয় করেন তখন তাঁকে সমস্ত সভ্য ধরণ-ধারণ ছেড়ে দিয়ে এই এস্কিমো পোষাকে, এস্কিমো উপায়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। না হলে তিনি মেরু-জয় করতে পারতেন না কিন্তু সে কথা পরে। এই এস্কিমোরা শীতকালে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় ব্যবহার করত তিমির হাড়ের শ্লেজ,—আর সেই শ্লেজ টানত তাদের কুকুরেরা। শীতের উপযোগী লোমে ঢাকা নেকড়ে বাঘের মত দেখতে এই এস্কিমো কুকুরগুলোই মেরুরদেশে মানুষের প্রধান সহায়। এরা শিকারে সাহায্য করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শ্লেজ টেনে নিয়ে যায়—এদের না হলে হিমরাজ্য কোনদিনই বিজীত হত না।

ফর্বিশার্ এর পর ডেভিস্, হাডসন্ প্রভৃতি অনেকেই মেরুপ্রদেশের অনেক অংশ আবিষ্কার করলেন। একটু একটু করে উত্তরের দিকে এগোন হতে লাগল। হাডসন্ উত্তরে আশী ডিগ্রী—তেইশ মিনিট পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন। এরপর বহুদিন পর্য্যন্ত এর উত্তরে কেউ যায়নি। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে হাডসন্ মেরুদেশেই মারা যান।

ইংলণ্ডের মতলব ছিল আমেরিকার উত্তর ধার দিয়ে মেরুপ্রদেশের ভিতর দিয়ে এসিয়াতে গিয়ে পড়বে। এই উত্তর-পশ্চিম জলপথই এতদিন ধরে ইংলণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ইতিমধ্যে অন্যান্য দেশের লোকেরাও মেরু সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠল। ওলন্দাজ, নরওয়ে,

জার্ম্মান, ইটালি প্রভৃতি জাতিও ধীরে ধীরে মেরু সমুদ্রে জাহাজ পাঠাতে আরাম্ভ করলে। এদের মধ্যে অনেকেই জীবন বিপন্ন করে প্রাণ দিয়ে মেরুপ্রদেশের অনেক সমুদ্র, অনেক দ্বীপ, উপসাগর প্রভৃতি আবিষ্কার করেছেন। সমস্ত দেশের অভিযানকারীদের মধ্যে লি স্মিথ্, এলিসা কেণ্ট্ কেন্, স্যার্ জর্জ্জ নেয়ার্স, স্যার্ জন্ রস্, স্যার উইলিয়াম এডওয়ার্ড প্যারী, স্যার্ জন্ ফ্রাঙ্কলিন্, স্যার্ রবার্ট ম্যকলিওর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্যারী ৮২ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট উত্তর ল্যাটিচিউড্ পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন। স্যার্ জন্ ফ্রাঙ্কলিন্ উত্তর-পশ্চিম জলপথ আবিষ্কার করে সেই মেরু দেশেই প্রাণ হারালেন।

মেরু প্রদেশের অনেক অংশ আবিষ্কৃত হল কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত উত্তর-মেরু পোঁছবার চেষ্টা কেউ করেনি। এইবার ইউরোপের সব জাতই প্রায় আর আমেরিকাও সেই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল।

নান্‌সেন্‌ আর ডিউক অফ্‌ দি আব্রুৎসি

ইংলণ্ড থেকে লি স্মিথ্‌ তখন ফ্রান্‌জ্‌ যোশেফ্‌ ল্যাণ্ডএ আটকে পড়ে আছেন। তাঁর জাহাজ ভেঙ্গে গেছে। মেরুদেশের ভয়াবহ শীতকালই তাঁদের সেখানে কাটাতে হচ্ছে অসম্ভব কষ্ট বিপদের মধ্য দিয়ে। পরে অন্য জাহাজ তাঁদের উদ্ধার করে। সেই সময়ে আমেরিকা থেকে লেফ্‌টেনাণ্ট ডিলং জিনেট্‌ জাহাজে করে উত্তর-মেরু জয়ের আশায় যাত্রা করেন। এঁদের মতলব ছিল বেরিং প্রণালী দিয়ে গিয়ে নিউ সাইবিরিয়া দ্বীপ পুঞ্জ থেকে এঁরা মেরু জয়ে যাত্রা করবেন। অর্থাৎ এশিয়ার দিক থেকে। সান্‌ ফ্রান্সিস্কো থেকে যাত্রা করার পর খবর এল জিনেট্‌ বেরিং প্রণালী পার হয়ে গেছে, তারপর সব চুপচাপ। দু'বছর কেটে গেলে আমেরিকা ভীত হয়ে উঠল আরও দুই জাহাজ তার খবর আনতে উত্তরে গেল কিন্তু কোথায় কি? কোন চিহ্নমাত্র নেই! তারপরে, অনেক পরে গ্রীণল্যাণ্ডের দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের স্রোতে জিনেট্‌ জাহাজের ধ্বংসের টুক্‌রো সব ভেসে যেতে দেখা গেল। দক্ষিণ থেকে পশ্চিম উপকূলে গিয়ে সব জমছে জিনেট্‌ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। আবার জয়ী হয়েছে তুষারময় বরফ। ভেঙ্গে

টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে, জিনেট্‌ তার নাবিকেরা মরণের কোলে সুপ্ত।

কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষ থেকে নান্‌সেন্‌ মস্ত আবিষ্কার করেন এবং প্রায় উত্তর মেরুর কোলে গিয়ে পৌঁছান। ফ্রিৎজফ্‌ নান্‌সেন্‌ নরওয়ের লোক। অসীম কষ্ট সহিষ্ণু শীতে অভ্যস্ত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রীণল্যাণ্ডএর একধার থেকে অন্য ধার পর্যান্ত পার হন। গ্রীণল্যাণ্ড একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ, জলের ধার ছাড়া তার প্রায় সমস্তই বরফে ঢাকা আর সে পথ এমন বিপজ্জনক যে প্রায় মেরু জয়ের মতই এই কাজ কঠিন এবং গৌরবময়। যাই হোক ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তখন তিনি ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির কিউরেটর এই সময়ে একদিন আনমনা ভাবে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছেন এমন সময়ে জিনেট্‌ জাহাজের ধ্বংসাবশেষ গ্রীণল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কূলে পাওয়া গেছে তাঁর নজরে পড়ে। সেই থেকে হল তাঁর মেরু জয়ের সঙ্কল্প।

তখনও লোকের ধারণা ছিল উত্তর-মেরুতে আছে এক মহাদেশ —কিন্তু নান্‌সেন্‌ ভাবলেন ডিলংএর জাহাজ নিউ সাইবিরিয়া দ্বীপ-পুঞ্জের কাছে ধ্বংস হয়, তাহলে কি করে তার সব ভগ্ন অংশ, জাহাজের অন্যান্য জিনিসপত্র ইত্যাদি গ্রীণল্যাণ্ডের কূলে ভেসে এল? অনেকে নানারকম কথা বললেন কিন্তু নান্‌সেন্‌ স্থির করলেন উত্তর মেরুতে নিশ্চয়ই কোন দেশ নেই—উত্তর-মেরু সমুদ্রে ঢাকা এবং সমুদ্রের স্রোতে জিনেটএর জিনিসপত্র বেরিং প্রণালী থেকে সরল রেখায় উত্তর মেরুর খুব কাছে দিয়ে ভেসে এসেছে। তাহলে নিশ্চয়

বেরিং প্রণালীর দিক থেকে ফ্রান্জ্ যোশেফ্ ল্যাণ্ডএর দিকে মেরু সমুদ্রের স্রোত বইছে। আর জিনেটএর জিনিসপত্র যদি ভেসে আসতে পারে একটা জাহাজই বা কেন সে পথ ধরতে পারবে না? একটা জাহাজ বরফের মধ্যে আটকে বরফের সঙ্গেই ভাসতে ভাসতে মেরুর কাছ দিয়ে চলে যেতে পারে। নান্সেনএর এই সমস্ত মতকে তখনকার দিনের লোকেরা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু নান্সেনএর স্থির বিশ্বাস হল তাঁর ধারণা ঠিক। তিনি মেরু যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট নরওয়ের রাজা আরও সব ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য পেয়ে তিনি 'ফ্রাম' জাহাজে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ফ্রাম জাহাজ নান্সেনএর ধারণা অনুযায়ী বিশেষ ভাবে তৈরী করা হয়েছিল। জাহাজের তলাটা ছিল ঠিক আধখানা ডিমের খোলার মত যাতে বরফের চাপে জাহাজ বরফের ওপর উঠে পড়তে পারে। জাহাজে মেরু প্রদেশের কষ্ট সহ্য করবার মত উপযুক্ত লোক বেছে নেওয়া হয়েছিল আর সঙ্গে ছিল পাঁচ বছরের খাবার।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন ফ্রাম সভ্য-জগতের সংস্পর্শ ছাড়িয়ে যাত্রা করল,কত সূর্য্যালোকিত দিন পার হয়ে, কত বিষণ্ণ ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে সমাচ্ছন্ন হয়ে—বুকে নিয়ে কয়েকজন অসমসাহসী বীর হৃদয়। জল, বরফের পাহাড়, জল। ভয়ঙ্কর কারাসমুদ্র পার হয়ে, চেল্যুস্কিন্ অন্তরীপ ছাড়িয়ে গিয়ে চলল ফ্রাম বিপদ হতে ঘনতর বিপদের মধ্যে। পার হয়ে গেল ৭৭° উত্তর ল্যাটিচিউড, পার হয়ে গেল ৭৮½° উত্তর

ল্যাটিচিউড্ তার পরে দেখা দিল অভিযানকারীর চিরশত্রু বরফ, বরফ —মেরুদেশের বরফের সব চাঁই। কিন্তু অন্য জাহাজের মত ফ্রাম বরফকে জয় করতে আসেনি—সে এসেছে মিতালী করে সঙ্গে যেতে। নান্‌সেন ইচ্ছা করেই বরফের ওপর জাহাজ তুলে দিলেন। ফ্রাম বরফের চাঁইয়ের মধ্যে বন্দী হয়ে ভেসে যেতে লাগল। নান্‌সেন প্রমাণ দিতে বসলেন তার মতের। তখন সেপ্টেম্বর মাস। ফ্রাম ত বন্দী হয়ে ভেসে চলল কে জানে ওই কয়টা লোকের ভাগ্যে কি আছে? যদি নান্‌সেন্‌এর মত ভুল হয় তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু বিপুল সাহসে সকলে মন বেঁধে রইল—নানা রকম বৈজ্ঞানিক তথ্যে মনকে ব্যাপৃত রেখে! নান্‌সেন্ বলেছিলেন ঠিক মেরুতে পৌঁছানই আমাদের ততখানি উদ্দেশ্য নয় যতটা মেরুদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করবার।

এমনি করে এসে গেল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শরৎ তখনও ফ্রাম ভেসে চলেছে কিন্তু অত্যন্ত ধীরে, তাঁরা তখন ৮২° উত্তর ল্যাটিচিউডের কাছাকাছি। নান্‌সেন্ দেখলেন যে রকম ধীরে তাঁরা ভেসে চলেছেন তাতে ফ্রান্‌জ্ যোশেফ্ ল্যাণ্ডেই পৌঁছতে আরও চার বছর লাগবে আর মেরুর যতখানি নিকট দিয়ে তাঁরা ভেসে যাবেন ভেবেছিলেন বরফের দল সেই আশানুযায়ী না যাওয়ায় নান্‌সেনএর মনে আরও এক বিপজ্জনক সঙ্কল্প জাগল। তিনি স্থির করলেন ৮৩° ল্যাটিচিউডে পৌঁছে মাত্র একজনকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর মেরুর দিকে একটা লম্বা পাড়ি দেবেন। তিনি তাঁর লেফ্‌টেনাণ্ট অটো স্বেড্রুপকে একথা

জানালেন এবং তাঁর ওপর জাহাজের ভার দেবার ব্যবস্থা করলেন। ওদিকে স্বেড্রুপেরও ভয়ানক যাবার ইচ্ছা কিন্তু দুজন নায়কই জাহাজ ফেলে যেতে পারেন না কারণ এরকম বিপজ্জনক যাত্রায় ফেরবার সম্ভাবনা খুবই কম। স্বেড্রুপ শুধু জানালেন যে নান্‌সেন্ যদি আগে দেশে পৌঁছতে পারেন এবং দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে যাত্রার ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি যেন তাঁর অপেক্ষা করেন। বীরের মত অসমসাহসী ইচ্ছা। জ্ঞানের নেশায় সুনিশ্চিত মৃত্যুমুখে এগিয়ে যেতে এদের একটি শিরাও কাঁপে না।

এদিকে নান্‌সেন্ ফ্রেডেরিক জোহান্‌সেন্‌কে সঙ্গী করে ১৮৯৫এর ১৪ই মার্চ জাহাজ ছেড়ে উত্তর মুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ২৮টা কুকুর কিছুদিনের খাদ্য, শ্লেজ আর সীলের চামড়ার নৌকো। পিছনে শেষ হয়ে গেল সভ্যজগতের সঙ্গে সামান্যতম সংশ্রবও—সামনে রহস্যময় বিরাট বিজন হিমরাজ্য যেখানে এতটুকুও প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় না।

তারপর দিনের পর দিন পথ-চলা—একটু একটু করে খাদ্য ফুরিয়ে যায় তখন খাদ্যের অভাবে বিশেষ প্রয়োজনীয় কুকুরগুলিকে একে একে মেরে খেতে হয়! চোখের সামনে শুধু বিস্তৃত সাদা—আর সাদা ধূ-ধূ করছে। কাণের পাশ দিয়ে তুষারবাহী কন্‌কনে ঝড় অট্টহাসি হেসে মৃত্যুবাণী শুনিয়ে যায়। পায়ের সামনে হঠাৎ যখন তখন বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয় কখনও বা ছুঁচোল মুখে ভরা বরফের এক পাহাড় সামনে পথ রোধ করে দাঁড়ায় তখন ১০৷১২ মন জিনিস

ভর্ত্তি শ্লেজ কাধে তুলে সেই অসম্ভব পাহাড় পার হতে হয়। শ্লেজ নামিয়ে এ পারে এসে মনে হয় শরীরটাকে যেন কে ভিজে গামছার মত নিংড়ে দিয়েছে। দারুণ শীতে ও ঘামে শরীর ভিজে যায়—সে আবার আর এক বিপদ, কারণ দেখতে দেখত গায়ের ওপরের সেই ঘাম জমে বরফ হয়ে যায়। এমনি করে তাঁরা ৮৬ ডিগ্রি ১৪ মিনিট উত্তরে এসে পৌঁছলেন আর মোটে ৩ ডিগ্রি ৪৬ মিনিট—কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া মানে মৃত্যু নিশ্চিত। শরীর অক্ষম, খাদ্যাভাব, বিরাট শ্বেত বাধা। এবারেও জয়ী হল বরফ। নান্‌সেন্ ফিরলেন। কিন্তু বিজীত হয়েও তিনি জয়ী—কারণ প্রমাণ হয়েছে তাঁর ধারণা ঠিক, মেরু প্রদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন আর ৮৬ ডিগ্রী ১৪´ মিনিট এপর্য্যন্ত পৃথিবীর মানুষের উত্তরতম নিশানা হল। এখন নিরাপদে যদি ফিরে যেতে পারেন তাহলেও অভিযান সফল হয়। কিন্তু সামনে পিছনে চারিদিকে শ্বেত হিম সমাধি, প্রাণহীন শৈত্য এই দু'টি স্পন্দমান প্রাণকে কোলে টেনে নেবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে লালায়িত হয়ে আছে। এই সময়ে এক এক বার তাঁদের মনে হয়েছে যে যদি দুজনের একজন কেউ মারা যান তাহলে এই বিজন হিম মরুভূমিতে অপরকে পাগল হয়ে যেতে হবে কিন্তু জোর করে তাঁরা সে ভয়ানক ভাবনা মন থেকে সরিয়ে রাখতেন।

পথ চলা আর চলা—ক্লান্ত অবসন্ন শরীরকে বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া। ৮ই এপ্রিল ১৮৯৫ তাঁরা ফিরতি মুখ ধরেছিলেন জুলাই মাসের শেষে মেরু সমুদ্রের বরফের কিনারায় এসে তাঁরা

দাঁড়ালেন—সামনে মাটী—মাটী স্থির দৃঢ় মাটী। দুই বিপজ্জনক বছরের পর আবার জীবনের ক্ষীণ আশা। নান্‌সেন্ ঠিক করে জানতে পারলেন না যে, যেখানে তাঁরা এসে উঠেছেন সেটা কোন্ জায়গা কারণ তখন মেরুর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে এখন মাসের পর মাস অন্ধকার। তবে তিনি অনুমান করলেন তাঁরা বোধ হয় ফ্রান্‌জ্ যোশেফ্ ল্যাণ্ডের কোন দ্বীপে উঠেছেন। এমনি করে অন্ধকার—নির্জ্জন অন্ধকারে শীতকাল কেটে গেল—জীবনের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, তারপরে একদিন এল সূর্য্য সগৌরবে, নিয়ে এল প্রাণ। অন্ধকারে জীবনের ক্ষীণায়মান আশা আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

তখন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস তাঁরা আবার দক্ষিণমুখে যাত্রা করবার ব্যবস্থা করছেন এমন সময়ে হঠাৎ বাতাসে মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে এল। জীবনে কোন সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনিও ঐ দুটি লোকের এর চেয়ে মিষ্টি লাগেনি। কাঁপতে কাঁপতে তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে রইলেন, ওদিকে গলার স্বর ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল। নান্‌সেন্ বুঝলেন ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা চলছে।

সমস্ত জগৎ ইতিমধ্যে ভাবছে নান্‌সেনের কি হল? তবে কি কোন বিপদ্? এই সময়ে ইংলণ্ড থেকে জ্যাক্‌সন্-হ্যামস্‌ওয়ার্থ অভিযান, ফ্রান্‌জ যোশেফ ল্যাণ্ডের সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করতে যায়। নান্‌সেন্, জ্যাক্‌সনেরই গলা শুনেছিলেন। পরমুহূর্ত্তে ছুটে গিয়ে নান্‌সেন্, জ্যাক্‌সনের হাত চেপে ধরলেন। জ্যাক্‌সন্ অবাক, দ্বীপের আশে পাশে কোন জাহাজ নেই অথচ দ্বীপে অদ্ভুত

গোছের একটা লোক! জ্যাক্‌সনের সঙ্গে লণ্ডনে নান্‌সেনের আলাপ হয়েছিল—কিন্তু নান্‌সেন্‌কে দেখে তখন তিনি চিনতে পারেন নি। একটা অসভ্য লোমওলা লোক, চট্‌চটে মুখ, হাত পা তুষারাবৃত, (তিন বছর নান্‌সেনের পোষাক খোলবার বা বদলাবার সুবিধা ছিল

নান্‌সেন্‌ ও জোহান্‌সেনের দেখা

না) এসে তাঁর হাত ধরেছে। কিন্তু মেরু প্রদেশের অভিযানকারীরা পরস্পরের বন্ধু কারণ সকলেই জানে কোনদিন এমন ভাগ্য বিপর্য্যয় তাঁরও ঘটতে পারে। ইংরাজ তাঁবুতে জ্যাক্‌সন্‌ তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পথে দু'একটা কথাবার্ত্তার পর নান্‌সেনের

মুখের দিকে গভীর ভাবে তাকিয়ে জ্যাক্‌সন্ বললেন—আপনি নান্‌সেন্ না ?

—হাঁ।

তখন কি আনন্দ !

সেদিন নান্‌সেন্ আর জোহান্‌সেন্, তাঁবুতে যে আরাম পেয়েছিলেন কোন রাজার ভাগ্যেও তা' জোটে না। তারপর ৭ই আগষ্ট উইণ্ড্‌ওয়ার্ড্ জাহাজে করে নান্‌সেন্ তাঁর বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। উইণ্ড্‌ওয়ার্ড্ জ্যাক্সনের অভিযানের খাদ্য আর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পৌঁছে দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছিল—পথে নান্‌সেন্‌কে নরওয়েতে নামিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত দেশ তাঁকে সাদরে বরণ করে নিলে, সমস্ত জগৎও তাদের আনন্দ-বার্ত্তা জানালে। এর কয়েকদিন পরেই আনন্দের ওপর আনন্দ স্বেড্রুপ্ নিরাপদে 'ফ্রাম্' জাহাজকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন।

মেরু যদিও বিজিত হলনা তবু নান্‌সেনের চেষ্টা—নান্‌সেনের আহৃত মেরু প্রদেশের তথ্যাবলী জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে বিপুল সঞ্চয় এনে দিল। যুদ্ধ তবু হলনা শেষ।

এইবার ইটালি একবার চেষ্টা করবে বলে নামল। ডিউক্ অফ্ দি আব্রুৎসির নেতৃত্বে এক অভিযান ফ্রান্‌জ্ যোশেফ্ ল্যাণ্ড দিয়ে বরফের ওপর হেঁটে মেরু অভিমুখে যাত্রা করল। ডিউক্ অফ্ দি আব্রুৎসি ও আরও কয়েকজন এই চেষ্টায় প্রাণ হারালেন এদের দলের ক্যাপ্টেন্ ক্যাগ্‌নি তিনজন সঙ্গী নিয়ে ৮৬ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট উত্তর ল্যাটিচিউড

পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন। নান্‌সেনের উত্তরতম সীমাও পার হয়ে গেল। ক্যাগ্‌নির দল কোন রকমে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন। এই সমস্ত জীবিত ও মৃত বীরদের কাছে জগৎ আজ সম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়। বহুবার বিফল হয়েও এদের কারও চেষ্টা বিফল নয়। এরা ধীরে ধীরে সৃষ্টি করে গেছেন পথ—আহরণ করেছেন জ্ঞান—মহার্ঘ্য জীবন দিয়ে। যে দিন মানুষের মেরু জয়ের চেষ্টা সফল হবে তখন এঁদের সকলের অশরীরী দেহ বিজয়ীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বিজয় গর্ব্বে উন্নীত হয়ে উঠবে। পিয়েরী যেদিন ৯০ ডিগ্রী মেরুর ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন কি এই সমস্ত দৃঢ়হৃদয় বীরদের অশরীরী দেহ তাঁর চারদিকে অদৃশ্যভাবে দাঁড়িয়ে হর্ষ প্রকাশ করেনি ?
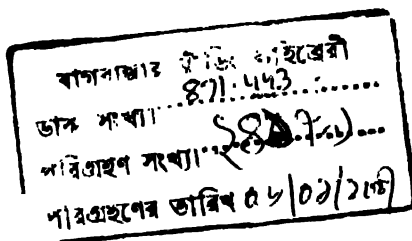
আবার
একজন অস্ত্র ধরলেন

এমনি করে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল। মেরুর হিমরাজ্য যেন ক্ষুদ্র মানুষের ব্যর্থ প্রয়াস দেখে গম্ভীর অনুকম্পার হাসি হাসল। অজেয়—অজেয় এই হিমরাজ্য, দুর্লঙ্ঘ্য এর বাধা—অপরাজেয় এর শক্তি। কত বীর হৃদয় এই তুষার যুদ্ধে প্রাণ দিল, শ্বেত সমাধির নীচে শায়িত কত বীর, মানুষের দুর্দ্দমনীয় চেষ্টার স্মৃতি চিহ্ন রেখে এল মেরুরাজ্য; তবু অনধিগম্য—বিরাট এক রহস্যময় জগৎ। নান্‌সেন্‌ ৮৬ ডিগ্রী ১৪ মিনিট উত্তরে পৌঁছলেন, ডিউক্‌ অফ্‌ দি আব্রুৎসি ৮৬ ডিগ্রী ৩৪ মিনিট পর্য্যন্ত পৌঁছে প্রাণ দিলেন—মেরু তবু অজেয়। ডিউক্‌ অফ্‌ দি আব্রুৎসির রেকর্ডই উত্তরতম নিশানা হয়ে রইল। তার পরে এই হিমদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রবার্ট-ই-পিয়েরী। অসীম অধ্যবসায়ী, অক্লান্ত পরিশ্রমী নির্ভীক চিত্ত এই আমেরিকানের দিকে সমস্ত জগৎ উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল—তবু এলনা জয়ের সংবাদ। এল পর পর পরাজয়ের বার্ত্তা। সেই চির-রহস্যময় হিমশীতল রাজ্য ব্যর্থ করে দিল সব চেষ্টা—তার রাজ্যে সে দেবেনা মানুষের প্রবেশাধিকার। তবু উৎসাহ কম্‌ল না পিয়েরীর।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীণল্যাণ্ডের এক অভিযানে গিয়ে পিয়েরীর মনে প্রথম মেরু-জয়ের সঙ্কল্প জাগে তখন তিনি আমেরিকার এক যুদ্ধ-জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার। যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ। ইঞ্জিনিয়ারীং-এর কাজ থেকে ছুটী নিয়ে তিনি বরফের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত হলেন। প্রথমে তিনি গ্রীণল্যাণ্ডের অনেক অজ্ঞাত অংশ আবিষ্কার করে বরফের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শক্তি ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তার পর মেরুদেশ।

তাঁর প্রথম মেরু অভিযান ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত। এবারে তিনি বেশী দূর যেতে পারেন নি জলের মধ্যে বড় বড় পর্ব্বত প্রমাণ ঘন বরফের চাঁই তাঁর জাহাজের পথ রোধ করে রইল। উত্তর মেরু থেকে প্রায় সাতশো মাইল দক্ষিণে তাঁকে তাঁবু ফেলতে হল। তারপরে এই খাদ্যহীন হিমের দেশে কেউ সাতশো মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে পারে?

ব্যর্থ হল প্রথম অভিযান।

পিয়েরী দেখলেন মেরুজয় করতে হলে যতদূর সম্ভব জাহাজে এগিয়ে যেতে হবে—পায়ে হাঁটার পথ যতদূর কমে যায়। এখন জাহাজে এগিয়ে যেতে হলে চাই এমন জাহাজ যে সহ্য করতে পারবে বরফের ধাক্কা, বরফের অসম্ভব চাপ—লড়তে পারবে কঠিন বরফের বিরুদ্ধে। তখন পিয়েরী প্ল্যান করে তৈরী করালেন রুজভেল্ট জাহাজ, দৃঢ়, দরকার মাফিক। সুরু হল দ্বিতীয় অভিযান। ১৯০৬ সালে পিয়েরী ৮৭ ডিগ্রী ৬ মিনিট পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন। নান্‌সেন্‌ ও

ডিউক্ অফ্ দি আব্রুৎসির রেকর্ড খর্ব্ব হয়ে গেল। আর মাত্র দুই ডিগ্রী ৫৪ মিনিট বাকী—তবু হল না জয়। অসম্ভব তুষারময় ঝড় আর পথে হঠাৎ বরফের চাঁই সরে গিয়ে প্রকাণ্ড জলপথ তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল। দলবল নিয়ে প্রাণ হারাতে হারাতে বেঁচে গেলেন তারা। কোন রকম করে জীবন্মৃত হয়ে ফিরে এলেন সকলে। ব্যর্থ হল দ্বিতীয় অভিযান।

আগে লোকের ধারণা ছিল—আর্টিক সার্কলের মধ্যে এক বিস্তৃত মহাদেশ আছে। নান্‌সেন্ প্রথম বলেন উত্তর-মেরুতে জমি নেই, উত্তর-মেরু সমুদ্রের ওপর অবস্থিত। পিয়েরী পরে সে কথা প্রমাণ করেন। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর উত্তর-মেরুতে প্রকাণ্ড একটা বাটীর মত ফাঁপা অংশ আছে (a deep basin); তার ওপর জল জমে থাকে অসম্ভব শৈত্যে। এই জমা জলের ওপর দিয়েই হয় মেরুতে পৌঁছবার অদম্য চেষ্টা বার বার যা ব্যর্থ হয়ে গেল এ পর্য্যন্ত।

পিয়েরীর তৃতীয় অভিযান

বার বার ব্যর্থ হয়েও পিয়েরী দমলেন না। তখন ১৯০৮ সাল, জুলাই মাস পিয়েরী আবার যাত্রা করলেন। ২০ বছরের অভিজ্ঞতায়, যত কিছু দরকার হতে পারে, সব ভেবে যোগাড়-যন্ত্র করে নিয়ে-ছিলেন। পিয়েরীকে আর্টিক ক্লাব অর্থ সাহায্য করেন—এই ক্লাবের সাহায্য না পেলে হয়ত মেরুপ্রদেশ চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে যেত। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই রুজভেল্ট্ নিউ ইয়র্কের বন্দর ছেড়ে হিমের দেশের দিকে অগ্রসর হ'ল। রুজভেল্টের এই দ্বিতীয় যাত্রা—কে জানে এবারে সে জয়মাল্য নিয়ে ফিরবে কিনা? অভিযান-কারীদের মধ্যে সকলেই দৃঢ়, কর্ম্মঠ ও উৎসাহী। রবার্ট-ই-পিয়েরী অভিযান-নায়ক, ক্যাপ্টেন্ বার্টলেট্ রুজভেল্টের ক্যাপ্টেন্, ডাক্তার গুডসেল্ অভিযানের ডাক্তার, প্রফেসর রস্-জি মার্ভিন, ডোনাল্ড বি ম্যাকমিলান্, জর্জ্জ বরুপ্, ম্যাথু হেন্সন্ অভিযান-নায়কের সহকারী। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আর জাহাজের নাবিকেরা ত ছিলই।

২০ বছরের অভিজ্ঞতায় পিয়েরী বুঝেছিলেন যে, অভিযানে লোক বেশী হলে অভিযান ব্যর্থ হবে কারণ খাদ্যের অভাব ঘটবে। এবারে তাঁর মতলব ছিল কম সভ্য লোক নেওয়া, এস্কিমোদের সাহায্য নেওয়া কারণ তারা মেরু-প্রদেশের লোক, কষ্ট ও শৈত্যে অভ্যস্ত,

এস্কিমো কুকুর
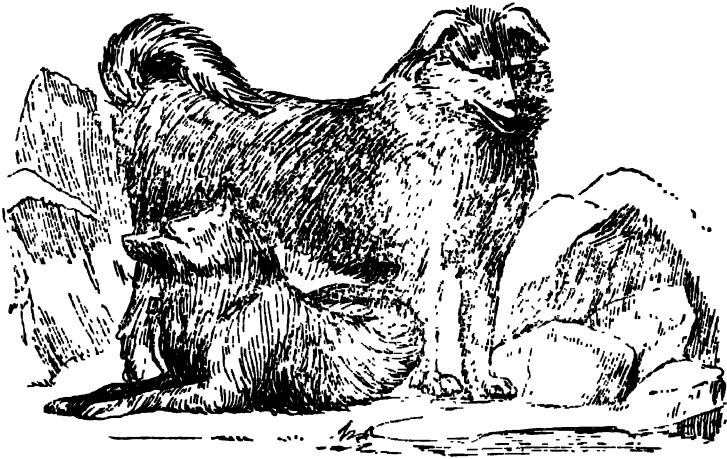
আর যথেষ্ট এস্কিমো কুকুর নেওয়া, কারণ তুষার রাজ্যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার, মালপত্র টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে এরাই একমাত্র সহায়।

এস্কিমো

তখনও সে বহুদিনের কথা, তখনও উত্তর মেরু-সমুদ্রে নির্ভীক মানুষের জাহাজ ভাসেনি, সাদা বরফের মরুভূমি তার কৌমার্য্য রক্ষা করে এসেছে নিঃশঙ্ক চিত্তে, তখন থেকে কিংবা আরও কত আগে থেকে যে কয়েকদল যাযাবর লোক সুমেরুর কোলে এই তুষার-মণ্ডিত চির হিমের রাজ্যে বাস করত, কেউ জানে না। গ্রীণল্যাণ্ডের উপকূলে, মেলভিল দ্বীপে, আমেরিকার সুদূর উত্তর প্রান্তে এশিয়ার উত্তরাংশে, দিনের পর দিন বরফের মধ্যেই এরা দিন কাটিয়ে দিত। এরাই ছিল পৃথিবীর উত্তরতম সীমানার অধিবাসী।

*

ধূ-ধূ বিস্তৃত বরফাচ্ছন্ন প্রান্তর, নিস্তব্ধ মৃত জগৎ, কোথাও কোন প্রাণীর জীবন্ত গতিবেগ নেই, সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালার বিক্ষোভ তুষার আস্তরণের নীচেই অপ্রকাশিত। দু' একটা সিন্ধুঘোটক তীরে বরফের ওপর রোদে অলস ভাবে গা মেলে দিয়ে পড়ে আছে। তারা যে জীবন্ত এমন কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না তাদের ভঙ্গিতে। বরফ আর সূর্য্য ধাঁধিয়ে তুলেছে পরিমণ্ডল। হঠাৎ দিকচক্রবালে আবির্ভাব হল গুটি কয়েক কালো বিন্দু; আর দেখতে দেখতে সেই

সমাহিত মৃত জগৎ ভরে গেল অজস্র শব্দে গোলমালে। কুকুরের গভীর চীৎকার, সম্মিলিত মানুষের কলরব জীবন্ত করে তুলল চারপাশের মরু মেরুভূমিকে। ঘুমন্ত সিন্ধুঘোটকের দল হঠাৎ জেগে উঠে ঘোৎ ঘোৎ করতে করতে পিছলে জলে পড়ল, আলোড়িত হয়ে উঠল স্তব্ধ সমুদ্র তাদের বিশাল দেহ তাড়নায়। হঠাৎ যেন সমস্ত

সিন্ধুঘোটক
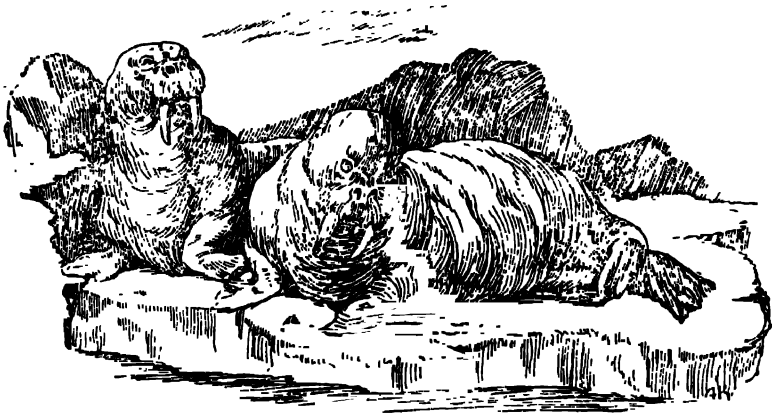
পরিমণ্ডলই ক্ষিপ্রভাবে জীবন্ত হয়ে উঠল। এসেছে যাযাবর এস্কিমোর দল। একটা সমতল জায়গা দেখে নিয়ে তাঁবু খাটাতে সুরু করল তারা, এখন ত শীতকাল নয় এখন এদের তাঁবুতে থাকলেই চলবে। তবে কাপড়ের তাঁবু নয়, এই হিমের দেশের সীলের চামড়া দিয়ে তৈরী তাঁবু, শৈত্যে অভ্যস্ত এই দৃঢ় লোকগুলির পক্ষে কন্‌কনে

বাতাস আটকাবার পক্ষে যথেষ্ট। এস্কিমোরা এক জায়গায় অনেকদিন ধরে থাকে না। এদের খাদ্য শুধু শিকারের মাংস তাই যে জায়গায় তারা বাস করে সেখানে শিকারের অভাব হলেই তল্পীতল্পা বেঁধে অন্য জায়গায় ভেসে পড়ে।

তাঁবু খাটান হয়ে গেলে দলের এস্কিমো মেয়েরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখতে হবে। আর পুরুষ কয়েকজন বল্লম হাতে একটা শ্লেজ সঙ্গে নিয়ে গেল শিকারের সন্ধানে।

দিক্‌চক্রবালে প্রকাণ্ড একতাল গলা সোণার মত সূর্য্য ঘুরে মরছে। বেলা বাড়ছে। সমুদ্রের ওপর বরফের আস্তরণ গলতে সুরু হয়েছে। জল বাষ্প হয়ে ওপরে উঠছে কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আবার জমে গিয়ে কুয়াশা হয়ে প্রকাণ্ড একটা সাদা চাদরের মত মাথার ওপর ভেসে রয়েছে। সমুদ্রের জলে দু'টো আইস্‌বার্গের ধাক্কা লাগল তারি প্রচণ্ড শব্দে দিক্‌মণ্ডল হঠাৎ ভরে উঠেছে। এস্কিমো কয়জনের ভাগ্যে আজ শিকার জুটছে না। জলে ছোট ছোট মেরু সমুদ্রের কয়েকটা মাছ তারা বল্লম দিয়ে মারল কিন্তু সমস্ত দলের পক্ষে ঐ কটি মাছ কি হবে? সীলের দল আজ যেন উপে গেছে, সিন্ধুঘোটকেরাও শত্রুর সন্ধান পেয়ে জলে ডুব মেরেছে। আজ কপাল মন্দ!

পায়ের নীচে বরফ কখনও কখনও বন্ধুর হয়ে উঠছে, কোথাও বরফের ছোট ছোট পাহাড় পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ মৃত

জগৎ কাঁপিয়ে মাঝে-মাঝে শুধু এস্কিমোদের কুকুর টানা স্লেজ চালানোর শব্দ ভেসে আসছে—হক্ হক্ হক্।

জলের ধারে বরফের ওপর কয়েকটা গর্ত্ত দেখে এস্কিমো ক'জন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চোখ যেদিকে যায় সব সাদা আর ধূসরের সমন্বয়ে একাকার। সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। এখানে চির রাত চির দিনের আধিপত্য নয়। সূর্য্য প্রতিদিনই অস্ত যায় তবে দিনের চেয়ে রাত অনেক বড়। কয়েকজন এস্কিমো সেই গর্ত্তগুলির ধারে বল্লম বাগিয়ে বসল শান্তভাবে অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, শীত বাড়তে লাগল, কুয়াশার আবরণ মেরুরাজ্যের ওপর যবনিকা টেনে দিলে। এস্কিমোরা তবু নড়েনা স্থির পাথরের মত তারা অপেক্ষা করছে। হঠাৎ একজন এস্কিমো চঞ্চল হয়ে উঠল, টান হয়ে উঠল তার বাহুর পেশী, বল্লমের তীক্ষ্ণ মুখ ক্রুর একাগ্র। সেই গর্ত্তর মধ্যে সামান্য একটু শব্দ হল আর এস্কিমোর হাতের বল্লম বিদ্যুৎবেগে প্রবেশ করল সেই বরফের রহস্যে। একটা শব্দ, একটা মৃত্যু কাতর তীক্ষ্ণ চীৎকার—বাস, তারপরে সব চুপচাপ। একটা সীল মাছ আজ এস্কিমোদের আহার্য্যের সহায়তা করবে!

সীল মাছ যখন ডাঙ্গায় উঠে না তখন এমনি করে এস্কিমোরা সীল শিকার করে। সীল মাছ শত্রু-সম্ভাবনা দেখলে জলে ডুব মারে কিন্তু খুব বেশীক্ষণ জলে থাকতে পারে না। নিঃশ্বাস নেবার জন্য বাতাসের দরকার হয় তাদের। তাই তারা বরফের ফাটলের নীচে

জলের মধ্যে ডুবে থাকে আর নিঃশ্বাস নেবার দরকার হলে উঠে আসে জলের ওপরে গর্ত্তের মুখে। এস্কিমোরা শান্তভাবে অপেক্ষা করে সেখানে আর সীলের নিঃশ্বাস ছাড়ার শব্দে বুঝতে পারে যে এবার শিকার ওপরে উঠে এসেছে।
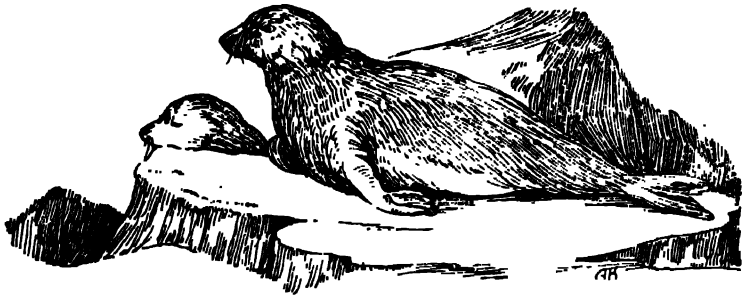
সীলমাছ

এমনি করে গুটি কয়েক সীল শিকার করে শ্লেজের ওপর চাপিয়ে তারা ফিরে চলল আড্ডায়। স্তব্ধ ভারাক্রান্ত রাত্রি, শীতের কুহেলিময় আবরণ পৃথিবীর ওপর বিস্তৃত। মাঝে মাঝে রাতের স্তব্ধতা কাঁপিয়ে কুকুরের ডাক থমকে মিলিয়ে যাচ্ছে। এস্কিমো তাঁবুতে আগুনের শিখা নেচে নেচে খেলা করছে! এস্কিমো মেয়েরা সীলের চর্ব্বি দিয়ে বাতি বানিয়েছে। হঠাৎ গম্ভীর রাত্রির গম্ভীরতা আরও বাড়িয়ে তাঁবু থেকে ভেসে উঠল সম্মিলিত কণ্ঠের অদ্ভুত আওয়াজ। এস্কিমোরা প্রার্থনা করছে তাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষদের কাছে। ভৌতিক শব্দ, যেন অশরীরী বহু মিলিত কণ্ঠের কান্না রাতের মাঝে

উঠে পরিমণ্ডলে কেঁপে কেঁপে মিশিয়ে যাচ্ছে। রাত্রি গভীর। পরদিন ভোর না হতেই একজন এস্কিমো ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে—বল্গা হরিণ, বল্গা হরিণ, এক পাল! দেখতে দেখতে প্রত্যেক

বল্গা হরিণ

তাঁবুতে সাড়া পড়ে গেল, শিকারীরা ব্যগ্র, ব্যস্ত ভাবে তৈরী হতে লাগল! বল্লম, বর্শা, যার যা শিকারের সরঞ্জাম ছিল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দলের সব পুরুষ। আর মেয়েরা অবসর পেয়ে পুরুষ শিকারীদের জন্যে জামা কাপড় শেলাই করতে বসল। এস্কিমোদের জামা-কাপড় সব মেরুদেশের জানোয়ারের চামড়ায় তৈরী। সীলের চামড়ার ফতুয়া, সাদা ভালুকের চামড়ায় প্যাণ্ট, হিমের দেশের

তোলে তখনও অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে—সহজ দৃঢ় সরল কয়টি লোক। জীবনে চিন্তা ভয় এদের নেই, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জীবনকে কাটিয়ে দেয় এরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিবর্ত্তন-হীন। মার্টিন ফরবিশার্ এদের যেমন দেখেছিলেন, কমাণ্ডার পিয়েরীও তেমনি দেখেছেন এদের। মেরু-অভিযানের প্রধান এক সহায়, এই কষ্ট সহিষ্ণু এস্কিমোরা!

কুড়ি বছর মেরুরাজ্যে কাটানর ফলে পিয়েরী মেরুপ্রদেশের লোক—এস্কিমোদের প্রায় সকলকেই চিনতেন, তাদের ভাষা বুঝতে ও বলতেও পারতেন। পিয়েরীকে এস্কিমোরা তাদের বন্ধু ও নেতা বলে ভাবতে শিখেছিল।

যাই হোক, রুজভেল্ট্ ৬ই জুলাই যাত্রা স্থরু করল—আমেরিকার তখনকার প্রেসিডেন্ট সিওডোর্, রুজভেল্ট্ জাহাজে এসে অভিযানকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন, প্রত্যেক বন্দরে জাহাজ, মানুষ, নগরবাসীরা সঙ্কেতে জানাতে লাগল তাদের শুভেচ্ছা। এত অভিনন্দন—এত আনন্দ ধ্বনির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল রুজভেল্ট্—হিমের বিরুদ্ধে অভিযানে, প্রকৃতির এক বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সিড্নী বন্দরে রুজভেল্ট্ কয়লা ভরে নিলে। নর্থ সিড্নী থেকে মিসেস্ পিয়েরী ছেলে মেয়েদের নিয়ে বিদায় নিলেন। এ পর্য্যন্ত

সীলমাছের গর্ত্তের ধারে···স্থির পাথরের মত অপেক্ষা করছে।

—পৃষ্ঠা ২৯

তিনি স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। কে জানে আবার কবে দেখা হবে, কে বলতে পারে আর দেখা হবে কিনা! সজল চোখে বিদায় নিলেন তাঁরা—পিয়েরীর পাঁচ বছরের ছেলে রবার্ট বাবাকে চুমো খেয়ে বললে "শিগ্‌গীর ফিরে এসো বাবা।" জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলল।

দ্বিতীয় দিনে সমুদ্র একটু অশান্ত হয়ে উঠল, তাছাড়া আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। এগিয়ে চলল জাহাজ। কেপ্ সেন্ট্ চার্লসে দুটো তিমি মাছ কিনে নেওয়া হল। তিমির মাংসে কুকুরের খাবার হবে। হক্‌স্ বন্দরে এরিক্ বলে একটা জাহাজ আরও পঁচিশ টন তিমির মাংস দিয়ে গেল। টুর্ণাভিক্ দ্বীপের কাছে উঠল এক ভীষণ ঝড়। সে কি বাতাস! আর তেমনি জল আর বজ্রাঘাত! কিন্তু রুজভেল্ট্ নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে গেল সেই বাত্যা। সোজা উত্তরমুখে চলেছে জাহাজ, একটু একটু করে রাত ছোট হয়ে আসছে—২৬শে জুলাই রুজভেল্ট্ মেরু-বৃত্ত পার হয়ে চির সূর্য্যের রাজ্যে গিয়ে পড়ল। এখন সব সময়ে দিনের আলো—ঘড়ি দেখে ঠিক করতে হয় রাত। সাধারণতঃ আমরা দিনের কতক অংশ পাই সূর্য্যের আলোয়, কতক অংশ রাত্রে। মেরুপ্রদেশে কিন্তু বছরের কয়েক মাস সূর্য্য অস্ত যায় না, আর কয়েক মাস একেবারে অন্ধকারে ঢাকা থাকে। রুজভেল্ট্ এখন চলল অস্তহীন সূর্য্যের রাজ্য দিয়ে। কেপ্ ইয়র্কের কাছে দেখা দিল—বরফের ভাসমান পাহাড়। এইখান থেকে এস্কিমোদের বসবাস সুরু। কেপ্ ইয়র্কের কাছে জাহাজ এগোতে না এগোতেই দলে দলে

এস্কিমোরা ছোট-ছোট নৌকো করে জাহাজে আসতে লাগল। পিয়েরীও চেনেন সকলকে—তারাও চেনে পিয়েরীকে, এ যেন পুরনো বন্ধুর দেখা হওয়া। পিয়েরী এখান থেকে অনেক এস্কিমো পরিবারদের জাহাজে তুলে নিলেন আর প্রায় একশো 'কুকুর' কিনে নিলেন। এস্কিমোরা অনেকটা বেদের মত, এক জায়গায় বেশীদিন থাকে না, তারা যেখানে যাবে সপরিবারে যাবে—তাই সপরিবারে তারা রুজভেল্টে উঠল। পয়লা আগষ্ট রুজভেল্ট্ কেপ্ ইয়র্ক ছেড়ে 'এটা'র দিকে চলল। পিয়েরী ইতিমধ্যে এরিক্ জাহাজে করে আরও এস্কিমো আর কুকুর জোগাড় করতে চললেন।

সিন্ধুঘোটকের আড্ডায়

এদিকে 'এটা' যাবার পথে উল্‌স্টেন্‌হোল্‌ম্ আর হোল্ সাউণ্ড পড়ে সিন্ধুঘোটকদের আড্ডায়। চারিদিকে জল, বরফ আর প্রাণীর মধ্যে সিন্ধুঘোটক। এই সিন্ধুঘোটক উত্তর-মেরুর অদ্ভুত এক পরাক্রমশালী জন্তু। এদের শিকার করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু মেরু অভিযানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ সিন্ধুঘোটকের মাংস এস্কিমো কুকুরদের এক প্রধান খাদ্য। হোল্ সাউণ্ড দিয়ে যাবার সময় জাহাজের ওপরে একজন এস্কিমো চেঁচিয়ে উঠল—"সিন্ধুঘোটক! সিন্ধুঘোটক !! একদল।"

দূরে বহুদূরে সাদা বরফের চাঁইয়ের ওপর কয়েকটা পোকার মত কালো রেখা। সমস্ত জাহাজে একটা উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। একটা নৌকোকে সাদা রং করে জলে নামান হল যাতে বরফের সাদার সঙ্গে সাদা নৌকোর বিশেষ তফাৎ না থাকে। জাহাজ থামিয়ে ফেলা হল কারণ ধোঁয়ার গন্ধ পেলেই জন্তুগুলো জলে ডুব মারবে—আর কোন চিহ্ন থাকবে না তাদের। নৌকোয় উঠলো বরুপ্ ম্যাকমিলান্ একজন নাবিক আর কয়েকজন এস্কিমো দাঁড়ী আর শিকারী। এস্কিমোদের হাতে বল্লম। এই বল্লমগুলো বিশেষ

ভাবে এই সব শিকারের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এর একদিকে সীলের চামড়ার দড়ীতে একমুখ আটকান থাকে আর অন্য মুখ সীলের চামড়ার বয়ার সঙ্গে লাগান, যাতে আহত জানোয়ারটা ডুবে গেলে একেবারে হারিয়ে না যায়। সেই বয়াগুলো মরা শিকার ভাসিয়ে রাখে।

নৌকো ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। বরফের চাঁইয়ের ওপর প্রায় দশ বারোটা জানোয়ার ঘুমচ্ছে। প্রকাণ্ড চেহারা, এক একটার ওজন ২৭।২৮ মণের কম হবে না। শত্রু যে ছদ্মবেশে এগিয়ে আসছে তারা জানে না। প্রায় ২০ গজ দূরে আছে এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড ষণ্ডামার্কা সিন্ধুঘোটকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠেই পাশের সঙ্গীটার গায়ে গজদন্ত দিয়ে মারল এক খোঁচা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সেটা জাগতে না জাগতেই বরুপ্ আর ম্যাকমিলানের বন্দুক গর্জ্জে উঠল। আহত সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা আর তার সঙ্গীটা জলের দিকে গড়িয়ে পড়তে না পড়তেই এস্কিমো-বল্লম সজোরে এসে গায়ে বিঁধল। তারপর আকাশ ফাটা মরণের চীৎকার। সব সিন্ধুঘোটকগুলো জেগে উঠল। ওদিকে উপরে গোলমালের সাড়া পেয়ে জলের নীচে থেকে আরও ২০।২৫টা জানোয়ার উঠে এসে নৌকো ঘিরে ফেলল। এস্কিমোরা দেখলে ব্যাপার সুবিধে নয়, তারা জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্যে সকলে মিলে বিকট চীৎকার সুরু করে দিল, নৌকোর হাল দিয়ে জন্তুগুলোর মাথায় পিটতে সুরু করে দিল। জল তোলপাড় হয়ে উঠল এই বুঝি নৌকো যায় যায়। একটা বিরাট জানোয়ার রেগে তেড়ে আসছে নৌকোর দিকে—বরুপ

এস্কিমো

সেটাকে গুলি করতে গিয়ে দেখেন বন্দুকে আর টোটা নেই। কিন্তু একজন শিকারীর বল্লম পায়ে গেঁথে সে জানোয়ারটা ডুব মারল। ওদিকে ম্যাক্‌মিলনের বন্দুক গর্জ্জে চলেছে—দ্রুম, দ্রুম।

হঠাৎ টর্পেডোর মত নৌকোর নীচে এক ধাক্কা—সকলে ছিটকে জলে পড়েছিল আর কি! ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে দেখা গেল হু হু করে নৌকোর তলা দিয়ে জল উঠছে। একটা রাগী জানোয়ার প্রকাণ্ড গজদন্ত দিয়ে নৌকোর তলা ছেঁদা করে দিয়ে গেছে, সকলের কোট শার্ট প্রভৃতি খুলে জোর করে ছেঁদার মুখে গুঁজে জল ছেঁচতে ছেঁচতে প্রাণপণে নৌকোর দাঁড়টানা সুরু করা হল। জল কিছুতেই আর আটকান যায় না—ঠাণ্ডা মৃত্যুশীতল জল। সামনে একটা বরফের চাঁই—প্রাণপণে—প্রাণপণে নৌকোর দাঁড় পড়ছে।

কোন রকমে বরফের চাঁইটায় পৌঁছেই নৌকো ডুবে গেল। তার পরে বিছিন্ন ভাসমান সেই বরফের ডেলা থেকে রুজভেল্টে বিপদ সঙ্কেত করা হল! এগিয়ে আসতে লাগল রুজভেল্ট্। জাহাজের ধোঁয়ার চিহ্ন পেয়েই সব সিন্ধুঘোটকের দল নিমেষের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

অভিযানকারীদের অভিযানে সে একদিন। তারপর বয়ার বাঁধা মরা সিন্ধুঘোটকের দলকে রুজভেল্টে তুলে নেওয়া অল্পক্ষণের ব্যাপার।

১১ই আগষ্ট এরিক্ জাহাজ এসে 'এটাতে' পৌঁছল। রুজভেল্ট্ অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। পিয়েরী আরও এস্কিমো আর কুকুর যোগাড় করে এনেছেন। সব এরিক্ জাহাজ ছেড়ে রুজভেল্টে গিয়ে উঠল। এইবার সুরু হবে আসল অভিযান।

এখন সুরু হবে বরফের বিরুদ্ধে রুজভেল্টের যুদ্ধ; তাই 'এটা'তে রুজভেল্টকে ধুয়ে মুছে বয়লার পরিষ্কার করে নতুন জল ভরে নেওয়া

হল, জাহাজের ইঞ্জিন পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া হল। ফেরবার মুখে দরকার হবে বলে 'এটা'তে ৫০ টন কয়লা জমা করে রেখে যাওয়া হল। ১৮ই আগষ্ট এরিক জাহাজের কাছে বিদায় নিয়ে সুরু হল উত্তরে যাত্রা। সেদিন কি ঝড় জল, আর তুষারপাত! 'এরিক্' সঙ্কেতে জানালে তার শুভেচ্ছা—বিদায়!

সভ্য জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সমস্ত সংস্রব। এখন থেকে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ জানবে না—ওই কটা লোকের কি হল।—কতবার যা ঘটেছে। স্যার্ জন্ ম্যাকমিলানের অভিযানের শেষ পরিণতি কি, কেমন করে হল কেউ জানেনা। কেউ জানেনা গ্রীলির অভিযানের কি পরিণতি? কে জানে ডিউক্ অফ দি আব্রুৎসি কোথায় কিসের অভাবে কেন শ্বেত সমাধির নীচে শায়িত হলেন? সামনে প্রকৃতি বিরাট হিমশীতল অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করে আছে আর মোচার খোলার মত একটা জাহাজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কয়েকটি মানুষ জয় করতে চলেছে তাকে।

পিয়েরীর মতলব ছিল রুজভেল্টকে কেপ্ শেরীডান্ পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তারপর সেখানথেকে পায়ে হেঁটে উত্তর মেরু যাত্রা সুরু। কিন্তু কেপ্ শেরীডান্ পর্য্যন্তই যাওয়া সহজ কথা নয়; প্রায় তিনশো মাইল বরফ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ধাক্কা মারতে মারতে একটু একটু করে কখনও সত্যি সত্যি ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোয়! যদি রুজভেল্টের কোন ক্ষতি না হয় তাহলেই আশা, আর রুজভেল্ট্ যদি বরফের চাপ সহ্য করতে না পারে তাহলে পিয়েরীর জীবনের স্বপ্ন সেইখানেই শেষ।

জল ঝড় আর কন্‌কনে তুষারপাত। রুজভেল্ট্ সাবধানে এগিয়ে চলেছে একটা প্রাকৃতিক বিষণ্ণতা চেপে বসেছে সকলের মনে—সামনে কালো কুয়াশা—হঠাৎ এক বিষম ধাক্কায় জাহাজখানা থর-থর করে কেঁপে উঠল। ব্যাপার কিছুই নয় একটা ছোট আইস্‌বার্গের সঙ্গে রুজভেল্টের সামান্য আলাপ হয়েছে মাত্র। কিন্তু অন্য কোন জাহাজ যদি হোত তাহলে তার যাত্রা ঐখানেই শেষ—রুজভেল্ট্ কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল।

উত্তর-পশ্চিমে এলেস্‌মিয়ার ল্যাণ্ড তারপরে কেপ স্যাব্‌াইন—জাহাজ এগিয়ে চলেছে। সামনে মৃত্যুর দূত বরফের চাঁইয়ের দল বাড়ছে—ক্রমাগত বাড়ছে। এক একটা ছোট-খাট পাহাড়, এদের সঙ্গে একবার ধাক্কা লাগলেই হিম সলিল-সমাধি। রুজভেল্ট্ কখনও পেছিয়ে আসছে, কখনও একটু ফাঁক পেলেই সশব্দে লাফ দিয়ে যেন পার হয়ে যাচ্ছে। এটা থেকে কেপ্ শেরীডেনের পথের প্রণালীতে দুদিকের স্রোত এসে মিশেছে। একটা স্রোত আসছে ব্যাফিন বে থেকে আর একটা লিঙ্কল্‌ন্ সমুদ্র থেকে। কাজেই এই প্রণালীতে বিশাল ঢেউ, তার ওপর বড় বড় আইসবার্গ, তার মধ্যে দিয়ে জাহাজ

চালিয়ে নিতে হবে, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণ হাতে করে। আগের অভিযানে রুজভেল্ট্ এই পথেই গিয়েছিল কিন্তু ফেরবার পথে প্রায় ধ্বংশ হয়ে কোন রকমে ভেসে আসে।

এইবার দ্বিতীয় অভিযান। ক্যাপ্টেন্ বার্টলেট্ জাহাজের মাস্তুলের ওপর সশঙ্ক চিত্তে পথ দেখছেন। ডাক্তার গুডসেল্, ম্যাক্‌মিলন্, বরুপ এরা নৌকোয় খাবার, ওষুধ, আর দরকারী জিনিসপত্র চাপিয়ে রাখছে যদি জাহাজ ভাঙ্গে তখনি নৌকো করে কোন এস্কিমো দেশে উঠতে হবে। এস্কিমোরা অপদেবতা তাড়াবার জন্যে অদ্ভুত স্বরে সকাতরে প্রার্থনা করছে। দ্বিতীয় দিন বিকেল বেলায় দক্ষিণ থেকে এক জোর বাতাস পেয়ে রুজভেল্ট্ বরফের সঙ্গে ভেসে চলল। তার পরে ধীরে ধীরে বরফ গলতে সুরু করায় আবার উত্তর পশ্চিম মুখো চালান হল জাহাজ। এমনি করে কখনও বরফে আটকে কখনও সামান্য একটু ফাঁক পেয়ে ছুটে চলা, মরণকে প্রতিমুহূর্ত্তে সামনে রেখে—এ যাত্রার কোথায় শেষ কে জানে?

এস্কিমোদের এই সময়ে সব সময়ে ব্যস্ত রাখা হোত পাছে তারা ভয় পায়। মেয়েদের এস্কিমো-পোষাক তৈরী করতে দেওয়া হয়েছিল; অভিযানকারীদের দরকার হবে। এই হিমের রাজ্যে সভ্য জগতের কোন পোষাক সম্ভবপর নয়। সিলের চামড়ার এস্কিমো গেঞ্জী, সাদা ভালুকের চামড়ার ওপরের পোষাক, সীলের চামড়ার জুতো ভালুকের চামড়ার মাথা মুখ ঢাকা। সব লোমের দিকটা ভিতরে। পুরুষদের সব শ্লেজ তৈরী করতে লাগিয়ে দেওয়া হল।

এস্কিমোরা তিমির চোয়ালের হাড় দিয়ে শ্লেজ তৈরী করত। কিন্তু পিয়েরী শক্ত কাঠ ইস্পাত দিয়ে মুড়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাই দিয়ে শ্লেজ তৈরী হতে লাগল। এতদিন পর্যান্ত প্রত্যেক মেরু অভিযানে এস্কিমো ধরণের শ্লেজ ব্যবহার হো'ত। পিয়েরী তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে আর এক রকম শ্লেজ তৈরী করিয়েছিলেন সেগুলোকে পিয়েরী-শ্লেজ বলা হয়। এই অভিযানের জন্যে দু'রকম শ্লেজই তৈরী হতে লাগল।

তৃতীয় দিনে আকাশের অবস্থা আরও খারাপ। সারাদিন বৃষ্টি, ঝড়, আর কন্‌কনে বাতাস। জাহাজ বেশীর ভাগ সময় বরফে আটকে আছে; অথবা বাতাসে বরফের মধ্যে আটকেই ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। এমনি করে ডবিন্ বের মুখে এসে বরফের বাঁধন খুলতে লাগল। তারপর রুজভেণ্ট্ বিনা বাধায় দশ মাইল ছুটে গেল। কিন্তু আবার হঠাৎ বিপদ কল বিগড়েছে, সামনে খোলা জল থাকতেও সুবিধা নেওয়া গেল না; মাঝ রাত্রের আগে আর জাহাজ চালান গেল না। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার বরফে বন্দী। চতুর্থ দিনটা পরিষ্কার সূর্য্যালোকিত দিন। রুজভেণ্ট্ ছুটে চলল—বরফ গলছে কিন্তু কিছু দূর এগিয়েই আবার ঘন কুয়াসা আর বরফ। সারা রাত বরফের মধ্যে দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে চলল ক'জন ভয়হীন দুর্দ্দার মানুষ। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্ডেল্ সব সময়ে ইঞ্জিন ঘরে। অ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের ওপর ছেড়ে দিয়েও তার ভরসা নেই। পিয়েরী জাহাজের ওপরে। হঠাৎ দেখা গেল

দুটো প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে মাঝখানে মোচার খোলার মত জাহাজ। এ সময়ে এক মুহূর্ত্তও যদি ইঞ্জিন ঘরে সামান্য কিছু হয় তাহলেই চাপে জাহাজ মুড়ির মত গুঁড়ো হয়ে যাবে। পিয়েরী নল দিয়ে ওয়ার্ডেল্‌কে ডেকে বললেন —"চীফ্‌ যে কোন উপায়ে এখন আপনাকে জাহাজ চলন্ত অবস্থায় রাখতে হবে যতক্ষণ না আমি বলি।" এ রকম অবস্থা দূরে থেকে কল্পনা করা যায় না। যাই হোক দৈত্য প্রমাণ বরফের পাহাড় দুটো কোলাকুলি করবার আগেই নিরাপদে জাহাজ পার হয়ে গেল।

একদিন জাহাজ তখন টুকরো টুকরো বরফের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, একদিকে তীর কাছাকাছি, মনে হল তীরে শিকার পাওয়া যাবে। ঘড়ির হিসাবে তখন রাত কিন্তু তখন চিরসূর্য্যের দিন ম্যাক্‌মিলান্‌ বরুপ্‌ আর গুডসেল্‌ বেরিয়ে পড়লেন ভাঙ্গা বরফের সব চাঁইয়ের উপর দিয়ে তীরের দিকে কিন্তু তীরে পৌঁছবার আগেই আশপাশের বড় বড় বরফের সব চাঁই সরতে সুরু করল। পিয়েরী দেখলেন অবস্থা সুবিধা নয় তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে আসবার সঙ্কেত করলেন। তখন সব বরফ চলতে সুরু করেছে, ফেরা মুস্কিল হয়ে উঠল, বিশেষতঃ বড় বন্দুকগুলি বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়াল। সৌভাগ্যক্রমে নৌকোর হুক বাঁধা লাঠি সঙ্গে ছিল তারই সাহায্যে একটা বরফের চাঁই থেকে আর একটায় লাফিয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন কোন রকমে—কিন্তু বিপদ প্রায় হয়েছিল—বরুপ্‌ একবার

হঠাৎ পিছলে সেই হিম শীতল জলে পড়েছিলেন কিন্তু সামলে তখনি উঠে পড়লেন। জাহাজে এসে সকলের কি হাসি! মরণের মুখে যে হাসতে পারে না, সে মেরু-অভিযানের উপযুক্ত নয়।

২৫শে আগষ্ট রুজভেল্ট্ প্রায় কেপ্ ইউনিয়নের কাছে এসে পৌঁছাল। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, কন্‌কনে উত্তরে বাতাসে ভর করে গুঁড়ো বরফ তীরের মত এসে জাহাজকে আক্রমণ করছে, পাশে তীরভূমি প্রেতের রাজ্যের মত সমাহিত, শ্বেত সাগরের জল ঘন মসীবর্ণ। এইখানে তীরে পিয়েরী কিছু খাদ্য আর দরকারী জিনিস নামিয়ে রেখে গেলেন। জাহাজের ধ্বংস হবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তেই রয়েছে তাই ফিরতি-পথে যদি ডাঙ্গায় আসতে হয় এই ব্যবস্থা।

তারপর ৩০শে আগষ্টের কথা অভিযানকারীরা জীবনে ভুলবে না। এইদিন বরফের চাঁইগুলো রুজভেল্টকে নিয়ে যেন ফুটবল খেলেছে। পিয়েরী প্রায় সাতদিন বিনা বিশ্রামের পর একটু-খানি তাঁর কেবিনে শুয়েছেন হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় তাঁর বিশ্রাম ঘুচে গেল, ডেকে ছুটে এসে দেখেন প্রকাণ্ড পর্ব্বত প্রমাণ এক বরফের পাহাড় স্রোতে ভেসে এসে একটা আইসবার্গকে ধাক্কা মেরেছে সেটা আবার সেই শক্তিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে জাহাজে পড়ে। মারভিনের ঘরের একটা অংশ নেই। সেই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই দেখা গেল জাহাজের প্রোপেলারের সঙ্গে দড়ী আটকে গেছে। সেটা ঠিক করতে না করতেই আবার এক আইসবার্গ এসে

মারলে ধাক্কা। হু-হু করে বরফের সব চাঁই ভেসে আসছে, জলের তলা থেকে সব আইসবার্গ মাথা ঠেলে উঠছে। সামনে পেছনে পাশে কেবল শত্রু শত্রু—বরফ! বরফের দল নিজেরা ধাক্কা খাচ্ছে, ভাঙ্গছে আর সেই সব ভাঙ্গা বরফের চাঁই গোলার মত মাথার ওপর দিয়ে এসে জাহাজে পড়ছে। ক্রমে চারিদিক থেকে বরফ এসে জাহাজকে আক্রমণ করলে। জাহাজ এখন সম্পূর্ণ বরফের দয়ার ওপর! কিন্তু পিয়েরী চুপ করে থাকবার পাত্র নন! তিনি বললেন ডিনামাইট্ দিয়ে চার পাশের সব বরফ উড়িয়ে দাও জাহাজ এই ভয়ঙ্কর চাপ সহ্য করতে পারবে না।

তারপর—দ্রুম্ দ্রুম্ ডিনামাইটের সশব্দ গর্জ্জন—আশপাশের চাপ ধীরে ধীরে কমে গেল জাহাজ কখন এক পাশে কখনও অন্য পাশে হেলে জলে নামতে লাগল। কিন্তু যাত্রা একেবারে বন্ধ। এখানে জাহাজ কিছুদিন আটকে রইল তারপর ২রা সেপ্টেম্বর মাঝ রাতে পথ খানিকটা পরিষ্কার হওয়ায় রুজভেল্ট্ আবার চলতে স্থরু করল। এমনি করে বাধা আর মৃত্যুসম্ভাবনার মধ্য দিয়ে পাঁচ তারিখে কেপ্ শেরীডান্ দেখা দিল। সওয়া সাতটার সময় জাহাজ কেপ্ শেরীডানে পৌঁছল।

২৩শে আগষ্ট থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পিয়েরী আর ক্যাপ্টেন বার্টলেট্ জামা-কাপড় ছাড়বার সময় পাননি।

এক একটা অনুভূতি—এক একটা অভিজ্ঞতা মানুষ বর্ণনা করতে পারে না। এই সময়ে অভিযানকারীদের মনের অবস্থাও বর্ণনাতীত।

হিমরাজ্যের সিংহদ্বারে তাঁরা উপস্থিত। কে জানে এবারেও তাঁরা বিফল হবেন কি না। জাহাজের যাত্রা শেষ।

এবারে সুরু হবে অভিযানের দ্বিতীয় খণ্ড। সিংহদ্বার হতে মেরু পর্য্যন্ত শ্লেজে যাত্রা। সামনে জনমানবহীন বিরাট হিম-মরুভূমি—সমাহিত বিরাট গম্ভীর মূর্ত্তি প্রকৃতি—এতদিন পর্য্যন্ত মানুষের চেষ্টাকে তাচ্ছিল্য করে এসেছিল।

আশে-পাশে, সামনে-পিছনে বরফ এসে বন্দী করে ফেলেছে জাহাজকে। —পৃষ্ঠা ৭

আয়োজন ও যাত্রা

কেপ্ শেরীডানে জাহাজ নোঙ্গর করে মালপত্র সব নামিয়ে ফেলা হল। প্রায় সিকি মাইল সমুদ্র-তীর জাহাজের মালপত্রে, খাদ্যদ্রব্যে ভরে গেল। এইখানে অভিযানকারীদের শীতটা কাটাতে হবে—কাটাতে হবে কয়েকমাস সূর্য্যহীন চিররাত্রির রাজ্যে। সূর্য্য তখনও অস্ত যায় না, তবে তেজোহীন হয়ে আসছে। একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণগোলক দিকচক্রবাল ঘেঁসে দিনের পর দিন পাক খাচ্ছে। রাত্রি আসবার আগে অভিযানকারীরা শিকার করে দিন কাটাতে লাগলেন। ছোট ছোট সব দল করে, কয়েকজন এস্কিমো একটা শ্লেজ আর একজন করে দলনায়ক—এই ভাবে সকলে শিকার করতে বেরুলেন। শিকারের মধ্যে এখানে পাওয়া যায় মেরু-খরগোস, সাদা ভালুক, আর কস্তুরী গাই। দু' একটা শেয়ালও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এর আগের অভিযানে পিয়েরী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন এখানে অনেক শিকার পেয়েছিলেন। এবারে প্রথমটা প্রায় কিছুই পাওয়া গেল না। তারপরে ধীরে ধীরে শিকার পাওয়া যেতে লাগল। ইতিমধ্যে যাত্রার আয়োজন করা হতে লাগল। পিয়েরী বুঝেছিলেন মেরু-অভিযান সফল করতে

হলে চাই—যথেষ্ট খাদ্য, খাদ্য বহন করার উপযোগী বাহন ও ফেরবার পথ। ফেরবার পথ মেরু-অভিযানের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। তাই তিনি স্থির করেছিলেন মেরু পর্য্যন্ত কয়েকটা ঘাঁটি বসিয়ে যাবেন, যাতে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকবে ফিরতি পথে দরকারের জন্য। তাহলে
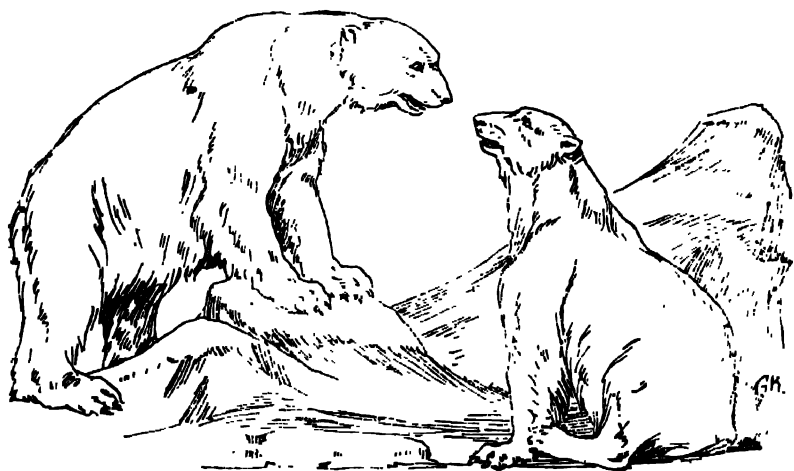
সাদা ভালুক

যাবার পথে বোঝা বাড়বে না, তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। পিয়েরীর এই তৃতীয় অভিযান তাঁর আশ্চর্য্য সংগঠন ও হিসাব শক্তির পরিচায়ক। প্রথম ঘাঁটি হবে স্থির হল কেপ্ কলাম্বিয়ায়। কেপ্ কলাম্বিয়া জাহাজ থেকে প্রায় ৯০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এই-খানেই যাত্রাপথের স্থলভাগ শেষ। এরপর বরফজমা মেরু-সমুদ্রের

ওপর দিয়ে পাড়ি দিতে হবে। স্লেজে করে মাল বহন করা আরম্ভ হল।

অনেকের ধারণা স্লেজে বুঝি মানুষ, মালপত্র শুদ্ধ চড়ে বসে আর এস্কিমো কুকুরে সহজ চক্‌চকে, বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ টেনে নিয়ে যায়। মোটেই তা নয়। এক একটা স্লেজে মালপত্র চাপান হয় আর সাধারণতঃ আটটা করে কুকুর পাশাপাশি স্লেজে জুড়ে দেওয়া হয়। আর সারা পথ স্লেজ চালককে সেই স্লেজের পিছনে পিছনে চলতে হয়, কখন দৌড়াতেও হয়। পথ অল্পভাগই সমতল, বেশীর ভাগ পথই বন্ধুর—উঁচু-নীচু, কখনও কখনও এত এবড়ো-খেবড়ো যে সেই বারো তেরো মণ স্লেজ উঁচু করে ধরে স্লেজ পরিচালককে কুকুরদের চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তখনই প্রাণান্ত। এস্কিমোরা কুকুরদের চালাবার জন্য ছপটি ব্যবহার করে। স্লেজের পিছনে দাঁড়িয়ে স্লেজ চালাতে হয় তাই ছপটির দড়ীগুলি প্রায় দশ, বারো ফুট লম্বা হয়। এস্কিমো পরিচালকরা এত অভ্যস্ত যে, সেই লম্বা চাবুক দিয়ে তারা ইচ্ছামত যে কোন কুকুরকে স্পর্শ করতে পারে।

যাই হোক জিনিসপত্র কেপ্ কলাম্বিয়ার দিকে যেতে সুরু করল। বেশীর ভাগ বহন কার্য্যই পিয়েরী ছাড়া অন্যান্য অভিযানকারীরা করতে লাগলেন। পিয়েরী তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করে রাখলেন শেষ উদ্যমের জন্য। এই সময়ে পিয়েরী একবার মাত্র কেপ্ শেরীডানের ঘাঁটি ছেড়ে বার হন, ক্লেমেণ্টস্ মার্কহাম্ ইনলেট্ অভিমুখে আবিষ্কার কার্য্যের জন্য। ১লা অক্টোবর তিনজন এস্কিমো তিনটি স্লেজ, কিছু

কুকুর আর দুসপ্তাহের খাবার নিয়ে পিয়েরী বেরুলেন। মেরুতে পৌঁছানই যদিও তাঁর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু মেরুরাজ্যের তখনও অনাবিষ্কৃত অংশগুলি আবিষ্কার করাও পিয়েরীর ইচ্ছা ছিল। তাই এই যাত্রা।

অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা পোর্টার-বে-তে পৌঁছলেন। পথ প্রায় সমতল। পোর্টার-বে পার হয়ে পশ্চিম তীর ঘেঁসে পথ। হঠাৎ দলের একজন এস্কিমো 'এগিন্‌ওয়া' বহুদূরে পাহাড়ের ওপর একটা কালো চলমান চিহ্ন দেখতে পেলে।

বল্গা হরিণ, বল্গা হরিণ—দলের সকলে দাঁড়িয়ে গেল। বহুদূরে হরিণটা ছিল বলে, পিয়েরী, এগিন্‌ওয়া আর উবলুইয়া দুজন এস্কিমোকে বন্দুক নিয়ে হরিণটাকে অনুসরণ করতে বললেন। ছুটল তারা। হরিণটা তাদের দেখে মন্থর গতিতে পালাতে আরম্ভ করলে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হঠাৎ হরিণটা চমকে ফিরে দাঁড়াল। এস্কিমোরা, পুরুষানুক্রমে অর্জ্জিত হরিণের ডাক নকল করে ডেকেছে। বন্দুক গর্জ্জে উঠল, কি যেন একটা পড়ে গেল—পিয়েরীর কুকুরগুলো শ্লেজ শুদ্ধ সেই দিকে দৌড় মারলে। তারা বুঝতে পেরেছে শিকার পড়েছে। চমৎকার হরিণটা। কেটে-কুটে শ্লেজে তুলে নেওয়া হল। টাট্‌কা হরিণের মাংসে সেদিন রাজভোগ হবে।

এস্কিমোদের হরিণ শিকার বড় চমৎকার। হরিণকে অনুসরণ করলেই সে হরিণ পালাতে সুরু করবেই—তাই এস্কিমোরা কাছাকাছি গিয়ে একটা পাথর বা কিছুর আড়ালে লুকিয়ে পড়ে তারপরে ঠিক

স্বর নকল করে বল্লা হরিণের ডাক ডাকে। হরিণের দল থমকে দাঁড়ায়, মনে করে, দলের কেউ বুঝি ডাকছে আর সেই সময়ে এস্কিমো-বল্লম এসে বেঁধে।

এই যাত্রায় পিয়েরী সাদা ভালুক ও কয়েকটি কস্তুরী গাই মেরে

কস্তুরী গাই

ছিলেন। কস্তুরী গাই মারা বেশ মজার ব্যাপার। শত্রু এলেই তারা দল বেঁধে গোল হয়ে দাঁড়ায়। সকলেরই বাইরের দিকে শিং। দলপতি শত্রুর দিকে মুখ ফিরে দাঁড়ায় শিং বাগিয়ে—এগিয়ে এলেই তার দফা শেষ। কিন্তু বন্দুকের কাছে দৈহিক শক্তি কতক্ষণ? দলপতির

মৃত্যু হলে তাঁর জায়গায় এসে দাঁড়ায় আর একজন, এমনি করে যতক্ষণ না দলের সকলে শেষ হয়।

প্রায় পনের দিনে পিয়েরী ক্লেমেণ্টস্ মার্কহ্যাম ইনলেটের অনাবিষ্কৃত অংশগুলি আবিষ্কার করে তার ম্যাপ করে নিয়ে এলেন, শিকারও যথেষ্ট হ'ল।

৫ই নভেম্বর, কেপ্ কলাম্বিয়ায় আড্ডা গড়া শেষ হয়ে গেল, সকলে কেপ্ শেরীডানে ফিরে এসেছে—ইতিমধ্যে সূর্য্য আর দেখা যায় না! অন্ধকারের সাথে-সাথে সমস্ত রাজ্য যেন মনে হয় বিরাট একটা মৃত্যু উপত্যকা। কিন্তু অভিযানকারীরা সকলেই সুন্দর স্বাস্থ্যে রয়েছেন, বেশীর ভাগ জমান খাদ্য যদিও কেপ্ কলাম্বিয়ায় চলে গেছে, কিন্তু সঙ্গে শিকারের টাট্‌কা মাংস রয়েছে, আর আছে সকলের মনে আশার স্ফুলিঙ্গ, জয়ের দৃঢ়পণ, বিজয়ী সঙ্কল্প।

তারপর বহু অভিশাপ নিয়ে অতিবাহিত হল সুদীর্ঘ রাত্রি! মেরু-দেশে যে না রাত্রি অতিবাহিত করেছে সে বুঝবে না মেরু-রাতের দীর্ঘ নৈরাশ্য। দিনের পর দিন মিট্‌মিটে ল্যাম্পের আলোয় জাগা আর ল্যাম্পের আলোয় শুতে যাওয়া। কখনও বা মৃত্যু-পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় সমাহিত শ্বেতরাজ্য রহস্যময় হয়ে ওঠে, সূর্য্যের আলোর জন্যে প্রাণ কাঁদে—কিন্তু কোথায় সূর্য্য? এমনি করে চারমাস কেটে গেল। পিয়েরী এই সময়ে সকলকেই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন—যা'তে না সুদীর্ঘ কালো রাত্রির নিরাশা বুকে চেপে বসে চাঁদ উঠলে তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সমুদ্রের স্রোতের গবেষণা ইত্যাদি

হঠাৎ হরিণটা চমকে ফিরে দাঁড়াল।

—পৃষ্ঠা ৫২

করা হোত। এস্কিমোরা শ্লেজ, পোষাক ইত্যাদি তৈরী করতেই ব্যস্ত থাকত। এমনি করে চারমাস কেটে গেল—সুদীর্ঘ রাত্রির পর দেখা দিল, ঊষা।

তারপর সুরু হল আসল যাত্রা। একদিন স্তিমিত ঊষালোকে বার্টলেট্ কেপ্ শেরীডান্ ছেড়ে যাত্রা করলেন। পথ ভাঙ্গবার কাজ তাঁর। মেরু-সমুদ্রে পথ বলে কিছু নেই, হয়ত এখানে খানিকটা, সমতল বরফ, আবার সামনে বরফের পাহাড়, কোথাও বা উটের পিঠের মত অসংখ্য বরফের কুঁজ। সেই বরফের ওপর শ্লেজ চলে গেলে যে পথ সৃষ্টি হয়, পিছনের দলের সেই পথে চলা অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর হয়। তাছাড়া আগের দল যে, থাকবার জন্য বরফের ঘর করে যায় সেগুলি ব্যবহার করা যায়। পিছনের দলকে নতুন করে সেই ঘর তৈরী করতে হয় না বলে যাত্রা খুব শীঘ্র হয়। এই বরফের ঘরগুলিকে এস্কিমোরা ইগ্লু বলে। চাঁই চাঁই বরফ দিয়ে বেশ ছোট-খাট একটা ঘর তৈরী করতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগে। অভিযান-কারীদের প্রত্যেককেই ইগ্লু তৈরী করা শিখতে হয়। অসম্ভব শীতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, ঝড় থেকে মাথা বাঁচানর জন্য মেরুতে এই বরফের ঘরগুলিই প্রধান অবলম্বন। ২২শে ফেব্রুয়ারী পিয়েরী কেপ্ শেরীডান্ ছেড়ে যাত্রা করলেন তখনও সূর্য্যালোক দীপ্ত নয়। অভিযানকারীরা সব দলে দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রধান দল হল পিয়েরী আর সব সাহায্যকারী দল। ঠিক হল সব দল গিয়ে প্রথমে কেপ্ কলাম্বিয়ায় মিলবে। পিয়েরীর এই যাত্রার

প্ল্যান খুব বিজ্ঞানসম্মত—কিন্তু সে বোঝাতে গেলে বই বড় হয়ে যায়। এখানে শুধু জেনে রাখা দরকার যে পিয়েরীর দলই মেরু পর্য্যন্ত যাবে তাই ওইটাই প্রধান দল। কাজেই ওই দলকে যতটা সম্ভব যাত্রার কষ্ট কমাতে হবে। অন্য সমস্ত দল প্রধান দলকে সাহায্য করবে। খাদ্যাভাব, কুকুরের অভাব ইত্যাদির জন্য সকলেরই মেরু
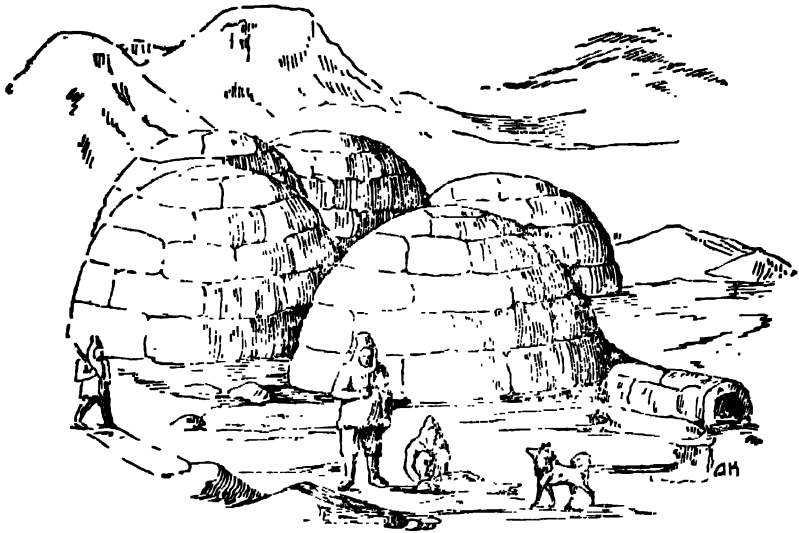
বরফের ঘর—ইগ্‌লু

পর্য্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয় তাই অন্যান্য দল নিয়মমত কিছু দূর এগিয়ে তার খাদ্যাদি, কুকুর প্রভৃতি প্রধান দলকে দিয়ে একটি মাত্র শ্লেজ নিয়ে ফির্‌আসবে। এই ছিল পিয়েরীর প্ল্যান।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন বার্টলেট আর বরুপ দলবল নিয়ে কেপ্‌

কলাম্বিয়া ছেড়ে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলেন। এই দুই দল এগিয়ে যাওয়ার পর ঠিক হল। মারভিন্, ম্যাকমিলান্ আর ডাক্তার গুড্‌সেল্ প্রধান দলের ঠিক আগে আগে কয়েকজন এস্কিমো নিয়ে, কুড়ুল দিয়ে বরফ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাবে। সব শেষে প্রধান দল।

১লা মার্চ্চ, ইগ্‌লু কাঁপিয়ে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে তুষারাক্ত বায়ু। আকাশে হীরের কুচির মত ঝলমল করছে তারা, বাতাস পূবে থেকে বইছে। কিছু দূর থেকেই দূর দূরান্ত পর্য্যন্ত একটা আবছা কুয়াশার চাদর। এক এক করে বার্টলেটের শ্লেজ চিহ্নিত পথে সকলে বেরিয়ে পড়ল, সবশেষে পিয়েরীর দল। তারপর শুধু পথ চলা দিগন্ত বিস্তৃত সাদা বরফের সমুদ্র, জনপ্রাণীহীন। যাত্রা আর যাত্রা। দূর দিগন্তে যেখানে ধূসর আকাশ এসে শ্বেত সমুদ্রে মিশেছে সেখানে দেখা যায় গুটি কয়েক কৃষ্ণ রেখা—মানুষ আর কুকুর। সর্পিল গতিতে চলেছে তারা কত বরফের পাহাড় এড়িয়ে, কত, স্তূপাকৃতি বরফের ওপর দিয়ে পথ করে এঁকে বেঁকে। উৎসাহী মানুষ আর কুকুরের কণ্ঠস্বরে আকাশ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। তারপর আসে শ্রান্তি, অবসাদ, কণ্ঠের স্বর শুকিয়ে আসে, তবু পথ আর শেষ হয় না, আর তবু চাই ছুটে চলা।

৮৩ ডিগ্রি পার হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর পিয়েরী দেখলেন মারভিনের দলের একজন এস্কিমো ফিরে আসছে সঙ্গে খালি একটা শ্লেজ। শ্লেজটা বরফের ধাক্কা খেয়ে এমন আহত হয়েছে যে তাকে একটা আড্ডায় ফিরে আসতে হয়েছে। এস্কিমোদের বিশ্বাস এই

সমস্ত বরফের উত্তর দেশ সয়তানের রাজ্য তাই শ্লেজ ভাঙ্গার দোষটা সয়তানের ওপর পড়ল। সয়তান তার দেশে মানুষকে ঢুকতে দিতে চায় না।

আরও কিছুদূর চলার পর বার্টলেট্ আর বরুপের পথকারী দলের ইগ্‌লু পাওয়া গেল। এখানে প্রধান দল বিশ্রামের জন্য থামল। একটা ইগ্‌লু নিলেন পিয়েরী আর একটা মার্‌ভিন্, ম্যাকমিলান গুড্‌সেল্ হেন্‌সন্ এরা ইগ্‌লু তৈরী করে নিল। একটা ইগ্‌লু পিয়েরীর আর অন্য ইগ্‌লুটা কার ভাগে পড়বে সেটা লটারী করে ঠিক করা হয়। পিয়েরী তাঁর ইগ্‌লুতে ঢুকে বিশ্রামের জন্য সবে মাত্র বসেছেন, হঠাৎ হেন্‌সনের দল থেকে একজন এস্কিমো চেচাঁতে চেচাঁতে ছুটে এল—সয়তান সয়তান! আমাদের আড্ডায় সয়তান ঢুকেছে।

ব্যাপার কি না অ্যাল্‌কোহল ষ্টোভ জ্বলছে না। তোমরা হাসছ, নয়?—সভ্যজগতের কেন্দ্রে বসে ব্যাপারটাকে হাস্যকরই মনে হয় কিন্তু ওই সামান্য একটা ষ্টোভের ওপর অভিযানের শুভাশুভ নির্ভর করত। ওটা না জ্বললে পানীয় গরম হবে না—মৃত্যুময় শীতের দেশে গরম পানীয় না হলে এক পাও চলা সম্ভব নয়। পিয়েরী বহন করার সুবিধা এবং আরও অন্যান্য সুবিধা ভেবে নিজে আবিষ্কার করে নূতন ধরণের এই অ্যাল্‌কোহল ষ্টোভগুলি করিয়ে এনেছিলেন। এখন এগুলি না জ্বললেই সমূহ বিপদ।

এস্কিমোদের বিশ্বাস সয়তান ষ্টোভে ঢুকে জ্বলতে দিচ্ছে না। কিন্তু ব্যাপার কিছুই নয় সেদিনটা ছিল অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। ভয়ানক

ঠাণ্ডায় অ্যাল্‌কোহলের ভেপার হচ্ছিল না একটা কাগজ জালিয়ে ষ্টোভ ধরাতেই আবার জ্বলে উঠল।

পিয়েরীর ওপর এস্কিমোদের অখণ্ড বিশ্বাস। সয়তানকে যে তাড়াতে পারে তার ওপর বিশ্বাস না করে বেচারীরা করে কি!

এমনি করে কেটে গেল মেরু-সমুদ্রের ওপর, প্রথম দিন।

সামনে কালো মেঘ

পরের দিন মেখলা কুয়াসার মধ্যে দিয়ে যাত্রা সুরু হল। পূবে থেকে সজোরে বাতাস বইছে। যাত্রা-পথ ভয়ানক বন্ধুর; সেদিন পথের প্রায় তিন ভাগ শেষ হয়েছে এমন সময়ে দেখা গেল সামনে আকাশে দিগন্ত জুড়ে ঘন কালো একটা রেখা। যেন কালো ধোঁয়ার একটা বেড়া পথ জুড়ে আছে। পিয়েরী বুঝলেন সামনে বিপদ। মেরু-সমুদ্রের বুকে বরফের আবরণ মাঝে-মাঝে জোর বাতাসের ধাক্কায় আর তলার স্রোতের টানে ভেঙ্গে গিয়ে সরে যায়। সৃষ্টি হয় তখন কালো জলের নদী—পথ রোধ করে। ঘোলা জল বাতাসে উবে যেতে থাকে আর ওপরে উঠতে না উঠতে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের প্রাচীর সৃষ্টি করে। এমনি এক ঘোলা জলের ধারে গিয়ে অভিযানকারীদের সেদিনের মত থামতে হল। যতক্ষণ না আবার দু'পারের বরফ এসে লাগবে, সামনের ঘোলা জলের ওপর আবার নতুন বরফের আস্তরণ জমবে ততক্ষণ উপায় নেই যাত্রার। রাত্রে রহস্যময় ঘড়-ঘড় শব্দ, বরফের ঠোকাঠুকি, গুড়ানোর শব্দ শোনা যেতে লাগল। পিয়েরী বুঝলেন জলপথের বাধা বুজে যাচ্ছে। পরদিন সেই নতুন বরফের ওপর দিয়ে প্রাণ হাতে করে যাত্রা সুরু হল।

এমনি করে বাধার পর বাধা আসতে লাগল—শেষে প্রকাণ্ড এমনি এক জলের ধারে এসে পিয়েরী থামতে বাধ্য হলেন। সামনে বার্টলেট্ এগিয়ে গেছেন। বরফের চাঁই পূবে-পশ্চিমে সরে যাওয়ায় তাঁর পথের চিহ্ন হারিয়ে গেছে। বরুপ্ প্ল্যান মত তাঁর খাদ্যাদি বার্টলেটের সঙ্গে দিয়ে আবার কেপ্ কলাম্বিয়ার ঘাঁটিতে ফিরে গেছেন আরো খাদ্য, স্লেজ, পেট্রল, স্টোভ প্রভৃতি নিয়ে এসে প্রধান দলকে সাহায্য করবার জন্য। প্রধান দল আটকে বসে আছে, সামনে পথ জুড়ে মৃত্যু শীতল কালো জল হাঁ করে আছে। প্রধান দলের পেট্রল টিন ফেঁদা হয়ে গেছে, আটকে থাকার জন্য খাদ্য কমে আসছে, পিছন থেকে সাহায্য না এলেই নয়। পিয়েরী মার্ভিনকেও বরুপের সাহায্যের জন্য পাঠালেন কিন্তু কোথায় কে? সামনের পথও নেই পিছনের সাহায্যও নেই। কে জানে বোধ হয় বরুপ্ আর মারভিন্ এমনি বাধায় আটকে পড়ে আছে উপায় নেই।

এই জল পথ যে কোন মুহূর্তে যেখানে সেখানে সৃষ্টি হতে পারে। ধর, সারাদিন চলার পর শ্রান্ত দেহ নিয়ে অভিযানকারীরা ইগ্লুর মধ্যে এলিয়ে পড়েছে। চোখে নেমে এসেছে শ্রান্তির গাঢ় ঘুম হয়ত তার মাঝে স্বপ্নে জেগে উঠছে জন-কোলাহলময় জন্মভূমি, প্রিয় পরিজন, ছেলে মেয়ের মিষ্টি মুখ। হঠাৎ চড়-চড় করে ইগ্লুর মাঝখান দিয়ে বরফ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। কি হল বোঝবার আগেই, মিষ্টি স্বপ্ন ভাঙ্গবার আগেই, মৃত্যুর শীতল করাল হাত অগাধ সমুদ্রের মধ্যে টেনে নিলে। শুধু দৈবক্রমেই এরকম ঘটনা অভিযানকারীদের ভাগ্যে ঘটেনি।

একটু একটু করে দীর্ঘ ভীতিকর পাঁচদিন কেটে গেল। সামনের কালো জল ক্রূর হাসি হাসছে। এস্কিমোরা সাহস হারিয়ে ফেলতে লাগল। মারভিন্ আর বরুপ্ যদি শুধু এসে পড়ে। দূর দিগন্তে যদি ফুটে ওঠে কয়েকটি পরিচিত কালো রেখা, শোনা যায় পরিচিত শ্লেজ তাড়নার চীৎকার! কিন্তু বৃথা আশা, বৃথা। এদিকে অভিযান-কারীদের আগুন জ্বালবার সরঞ্জাম শেষ, তখন শ্লেজ ভেঙ্গে তার কাঠ জ্বালিয়ে আগুন করতে হচ্ছে, হয়ত বা এবারে কাঁচা মাংসই চিবুতে হবে। তারপর ছ'দিনের দিন জল বুজে গেল। অবসান হল অপেক্ষা করার, এগিয়ে চলল দল। পিয়েরী ইগ্লুতে একটা চিঠি লিখে রেখে গেলেন—আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আগুন জ্বালাবার সব উপায় নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন করে পার আমাদের ধরে নাও।

সেদিন ১১ই মার্চ্চ, সেই দিনের যাত্রাতেই অভিযান ৮৪ ডিগ্রি ল্যাটিচিউড্ পার হয়ে গেল। সামনে বরফের চাঁই ভাঙ্গছে, গুঁড়ো হয়ে গোঙাচ্ছে। পিছনে তখনও স্থলদেশের স্বর্ণাভ বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। শীত যেন বাড়ছে ক্রমশঃ। সেদিনের টেম্পারেচার মাইনাস ৪০ ডিগ্রি। ব্র্যাণ্ডি জমে বরফ হয়ে গেছে, পেট্রোলিয়াম আইসক্রিমের মত থক্ থক্ করছে। কুকুরদের দৌড়বার সময় যে নিঃশ্বাস পড়ছে তা জমে গিয়ে তাদের চারধারে একটা কুয়াশার আবরণ তৈরী করেছে। ১৩ই আরো ঠাণ্ডা পড়ল। মাইনাস ৫৯ ডিগ্রি। পথ আঁকা বাঁকা, ভীষণ বন্ধুর ধারাল বরফ চারিদিকে। কখনও চড়াই কখনও উৎরাই। সেদিনের পথের শেষে শ্রান্ত দেহে

নিরাশ মনে সকলে ইগ্‌লু তৈরী করছে হঠাৎ একজন এস্কিমো নাচতে স্থরু করে দিল—স্লেজ আসছে স্লেজ আসছে।

সত্যি সত্যিই একটা স্লেজ আর মারভিন, বরুপের দলের একজন এস্কিমো! প্রাণপণে স্লেজ চালিয়ে এসে সে খবর দিলে মালপত্র নিয়ে বরুপ আর মারভিন্ একদিন মাত্র পিছনে আছেন কালকেই প্রধান দলকে তাঁরা ধরে নেবেন। ইতিমধ্যে বার্টলেট্ ও জলপথে আটকে প্রধান দলের সঙ্গে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে কি আনন্দ, নিরাশ প্রাণে যেন নতুন বল এল। সেই রাতে অভিযানকারীরা নিশ্চিন্ত মনে শ্রান্ত দেহকে ঘুমের কোলে এলিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন এইখান থেকে ডাক্তার গুডসেল্ ফিরে গেলেন। তাঁর যাত্রা এইখানেই শেষ। তাঁকে আর বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না কারণ পিয়েরী মাত্র কয়েকজন এস্কিমো নিয়ে মেরু পর্য্যন্ত যাবার চেস্টা করবেন বাকী সকলেই ফিরে যাবেন। আর দলের ডাক্তারের ওপর সেই সকলের জীবন নির্ভর করছে। ডাক্তার গুডসেল্ তাঁর ভার স্থসম্পন্ন করেছেন তাঁর স্থান এখন জাহাজে। তিনি ফিরলেন ৮৪ ডিগ্রি ২৯ মিনিট ল্যাটিচিউড্ থেকে। পরদিন বিকেলে মারভিন্—বরুপের দল এসে পৌছল। দূরে কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্ট মারভিনের মূর্ত্তি দিগন্তে ফুটে উঠল। যুদ্ধের পরাজয়ের মুখে যেন বিজয়ী কোন সেনাপতি অসংখ্য সৈন্যদল নিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসছে। আরও দু' তিনবার এমনি বিপদে পিয়েরীকে রক্ষা করেছেন এই অকুতোভয়ী স্বল্পভাষী রস্ মারভিন্; কিন্তু এ যাত্রায়

মারভিন্ যেন নিয়ে এলেন দেবতার আশীর্ব্বাদ—প্রাণ, মরণের মুখে জীবনের আশা। এইখানে অসম্ভব শীতে ম্যাক্‌মিলানের গোড়ালী জমে গেল। তাঁর পক্ষে আর এগোন অসম্ভব। পিয়েরী মনে করেছিলেন আরও কিছুদূর ম্যাক্‌মিলানের সাহায্য পাবেন। কারণ লোকটার অসম্ভব ধৈর্য্য, যখন এস্কিমোরা সাহস হারিয়ে পালিয়ে যাবার ছুতা খুঁজছে তখন ম্যাক্‌মিলানই তাদের সাহস দিয়েছেন, নানা খেলায় গল্প গুজবে ভুলিয়ে রেখেছেন। তাঁকে বিদায় দিে পিয়েরীর দুঃখ হল। কিন্তু বেচারীর আর যাবার উপায় নেই পায়ে অসম্ভব যাতনা। গোড়ালী জমে গেছে। এই রকম জমে যাওয়ায় মাঝে মাঝে সেই অংশ কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। পিয়েরীকেও এই অভিযানের শেষে পায়ের তিনটি আঙ্গুল কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। ম্যাক্‌মিলান ফিরলেন।

এখান থেকে আরও আট মাইল উত্তরে গিয়ে মারভিন্ মেরু-সমুদ্রের গভীরতা মাপলেন ১২৫ ফ্যাদম্। সন্ধ্যায় দিকে বরফে নানা রকম রহস্যজনক শব্দ শোনা যেতে লাগল। বরফ ভাঙ্গছে। হঠাৎ সামনে বরফ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে সরু একটা খাল সৃষ্টি করলে কিন্তু অভিযানকারীর দল থামলেন না। বরফের ভেলা করেই তাঁরা পারা হতে লাগলেন কিম্বা ভাঙ্গা বরফের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পর হয়ে যেতে লাগলেন।

সকলেই প্রায় তখন ওপারে—বরুপ্ একটার পর একটা বরফের চাঁইয়ের সাহায্যে সাবধানে কুকুরদের পার করাচ্ছেন, পিছনে শ্লেজ

গায়ের জোরে টেনে তুলে ফেললেন।

—পৃষ্ঠা ৬৪

তুলে ধরতে হচ্ছে। শ্লেজে খাদ্য দরকারী জিনিস প্রভৃতি ভরা। হঠাৎ কুকুরদের পা হড়কে গেল। সশব্দে অতল জলে গিয়ে পড়ল তারা, প্রায় আটটা কুকুর। শ্লেজও জলের মধ্যে যায় যায়। এখনই কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে যাবে ছয় মণ জিনিস সমেত শ্লেজে বাঁধা কুকুরের দল। বরুপের সবল মাংসপেশীতে ছিল অসম্ভব ক্ষমতা। তিনি লাফিয়ে গিয়ে গায়ের জোরে কুকুরগুলোকে শূন্যে টেনে তুলে ফেললেন।

সামান্য দেরী যদি হ'ত কিম্বা বাহুতে সামান্য শক্তির যদি অভাব হ'ত তাহলে সেই বরফের মরুভূমিতে হীরার চেয়েও মূল্যবান্ খাদ্য-দ্রব্য সমেত কুকুরগুলি অতল-তলে তলিয়ে যেত।

আগের ক্যাম্প থেকেই হেন্‌সনের ওপর পথ তৈরী করার ভার পড়েছিল। পরদিন কিছুদূর গিয়েই হেন্‌সনের ইগ্‌লু পাওয়া গেল। হেন্‌সন্ আটকে গেছেন—সামনে সেই জলের বাধা; যাই হোক এমনি করে এগিয়ে চলল অভিযান। টেম্পারেচার তখন মাইনাস ৫০ ডিগ্রি থেকে ৬০ ডিগ্রির মধ্যে। এর পাঁচদিন পরে অতিক্রান্ত হল ৮৫ ডিগ্রি ল্যাটিচিউড্। ৮৫ ডিগ্রি ২৩ মিনিট ল্যাটিচিউড্ থেকে ভারাক্রান্ত মনে বিদায় নিলেন বরুপ্। তাঁর কাজ তিনি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেছেন। পিয়েরী এঁর কাছ থেকে অসম্ভব সাহায্য পেয়েছেন। এই যাত্রায় পিয়েরীর সঙ্গীরা সকলেই অত্যন্ত উপযুক্ত কর্ম্মীলোক ছিলেন। এঁদের না পেলে পিয়েরীর জীবনের স্বপ্ন কোন দিন সম্পন্ন হোত কিনা কে জানে? বরুপ্ তিনজন এস্কিমো ষোলটি কুকুর আর একটা শ্লেজ নিয়ে দক্ষিণে ফিরলেন। এরপর পিয়েরীর

সাথে সব পুরোণ সাথী বার্টলেট্, মারভিন্ আর হেন্‌সন্। প্রধান দলে তখনও ১২ জন লোক ১০টা স্লেজ আর ৮৩টা কুকুর।

এখন থেকে সূর্য্য আর অস্ত যায় না। বরফে সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে লাগে, অনবরত সেই খর আলোকে চোখ জ্বালা করে। এবার থেকে বার্টলেট্ আর হেন্‌সন্ আগে আগে আর পিয়েরী আর মারভিন্ ১২ ঘণ্টার পথ পিছনে চলতে থাকলেন। সামান্য বিপদ আপদ লেগেই থাকত কিন্তু তবু অভিযান-দিনে প্রায় ১২ থেকে ১৪।১৫ মাইল পথ অতিক্রান্ত হচ্ছিল। সামনে আশা আর উৎসাহ।

বন্ধু বিদায়

২৫শে মার্চ্চ আগের দলের ক্যাম্পে বার্টলেট্ আর হেন্সন্ পিয়েরীর উপদেশ মত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। সাড়ে দশটায় প্রধান দল এসে পৌছাল। এইখানে গবেষণা করে জানা গেল তাঁরা ৮৬ ডিগ্রি ৩৮ মিনিট ল্যাটিচিউড্ পার হয়েছেন। নান্সেন্ আর ডিউক্ অফ্ দি আব্রুৎসীর্ সীমানাও তাঁরা ছাড়িয়ে এসেছেন। ২৬শে মার্চ্চ ভোর পাঁচটার সময় পিয়েরী সকলকে জাগিয়ে তুললেন। বার্টলেট্ শুধু এগিয়ে গেছেন। এখান থেকে প্রিয় বন্ধুদের একজন বিদায় নেবেন। মারভিনের এই সীমানা। দুজন এস্কিমো, একটা শ্লেজ আর ১৭টা কুকুর নিয়ে সাড়ে নয়টার সময় মার্ভিন্ বিদায় নিলেন। বার্টলেট্ আর মার্ভিন্ যেন পিয়েরীর—সবল কর্ম্মক্ষম দুই হাত। বিদায় মুহূর্ত্তে বিপদের কোন ছায়া ঘনিয়ে আসেনি, পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশ, বরফে রোদ পড়ে খোলা তলোয়ারের মত ঝলসাচ্ছে। মেরুর শূন্যতা থেকে কন্‌কনে শক্তিদায়ী বাতাস বয়ে আসছে। বিদায়ের আগে মারভিন্—পিয়েরীর সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। আশাপূর্ণ মুহূর্ত্ত—করমর্দ্দনে যেন সমস্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। বিপদের ঘনায়মানতা কোথাও নেই, তবু রস্ মারভিন্‌কে পিয়েরী আর জীবনে দেখেন নি।

মার্‌ভিনের চলে যাওয়ার পর থেকেই আকাশ ঘনিয়ে এল—মেঘ আর কুয়াশা। রোদ নেই পাণ্ডুর ধূসর আকাশ, সমস্ত যেন ঘৃণ্য প্রেতের রাজ্য। বিরাট থম্‌থমে শূন্যতা। ক্রমে ক্রমে পিয়েরীর আগের রেকর্ড তাঁরা পার হয়ে গেলেন—৮৭ ডিগ্রি ৬ মিনিট। বার্টলেট্‌ আগে, পিছনে পিয়েরী আর হেন্‌সন্‌। ২৮শে মার্চ্চ পিয়েরী আর হেন্‌সন্‌ বার্টলেটের ক্যাম্পে এসে পড়লেন। সামনে বিরাট এক জলপথে বার্টলেট্‌ আটকে আছেন। শ্রান্ত হয়ে বার্টলেট্‌ তখন ঘুমচ্ছিলেন বলে একশ' গজ দূরে পিয়েরী আর হেনসন্‌ তাদের ইগ্‌লু তৈরী করলেন। রাত্রে বরফের গর্জ্জন আর এস্কিমোদের চীৎকারে পিয়েরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি লাফিয়ে বাইরে এসে দেখেন তাঁর ইগলুর সামনে বাঁধা কুকুরদের এক ফুট মাত্র দূর দিয়ে বরফ ফেটে ফাঁক হয়ে গেছে, ওপারে বার্টলেটের ইগ্‌লু একটা ভাঙ্গা চাঁইয়ের সহিত পশ্চিমে ভেসে চলেছে আর এস্কিমোরা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। পিয়েরী সকলকে তৈরী হতে আদেশ দিলেন। গাঁইতি নিয়ে দলে দলে লোক দুদিকে তৈরী হয়ে রইল। বার্টলেট্‌ কুকুর শ্লেজ সব সন্ত্রস্ত ভাবে তৈরী করে রাখলেন। বরফ তখন ভাঙ্গছে গুঁড়চ্ছে যেখানে-সেখানে জল উঁকি মারছে। কিছু দূর গিয়েই বার্টলেটের বরফের চাঁই প্রধান দল যে তীরে ছিল তার কাছাকাছি হতেই গাঁইতি দিয়ে টেনে মুহূর্ত্তের মধ্যে বরফ কেটে বার্টলেটের দলকে এপারে নামিয়ে নেওয়া হল। বিপদ ত পদে পদে—মরণের কোলেই ত তাঁরা বসে আছেন। নূতন ইগ্‌লু তৈরী করে তাঁরা আবার ঘুমুতে গেলেন।

তারপর আবার চলা। পথ আর পথ। মানুষের অদম্য অধ্যবসায় —প্রকৃতির বাধার সঙ্গে যুঝবেই। ৮৭ ডিগ্রি ১৩ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ডে বার্টলেট্ ফিরলেন। পিয়েরীকে এইবার প্রধান দল মাত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ক্যাপ্টেন বার্টলেটের দীর্ঘ প্রশস্ত দেহ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে মিলিয়ে গেল, সুদূর দিগন্তে; পিয়েরী মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ভাব অনুভব করলেন। এঁদের নিয়েই ছিল এই মেরু-সমুদ্রে সংসার। কয়েকটি সমভাবাপন্ন মানুষ এক জোট হয়ে এক উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। একে একে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারা। আবার কি সকলে এক জায়গায় মিলিবে, আবার মুখরিত হয়ে উঠবে —পৃথিবী সকলের মিলিত কলরবে ?

পিয়েরীর সাথে তখন চারজন এস্কিমো আর হেনসন্— আমেরিকান্ নিগ্রো তাঁর নিজস্ব সহকারী, পাঁচটা শ্লেজ আর চল্লিশটি কুকুর, সামনে একশো তেত্রিশ মাইল পথ। এবারে প্রতিদিন অন্ততঃ পঁচিশ মাইল করে ছুটতে হবে। দেহের আর মনের সমস্ত শক্তিকে উৎক্ষিপ্ত করে সোৎসাহে শেষটুকু সম্পন্ন করতে হবে। বিপদ্ আপদ্ যাই ঘটুক এতদূর পর্য্যন্ত আশানুযায়ী হয়েছে। এইবারে শেষ। পিয়েরীর মন আশায় ভরে উঠল---হয়ত বা জীবনের স্বপ্ন এতদিনে সফল হবে, এতদিনে অজেয় সুমেরুর পরাজয় মানুষের কাছে।

পৃথিবীর উত্তরতম সীমানায়

হু-হু করে মেরুর ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে আসছে। চড়াই আর উৎরাই। বিজয়ী সেনাপতির মত দলের আগে পিয়েরী। স্বচ্ছ সূর্য্যালোক। সজীব মন দিয়ে ছুটে চলেছে সকলে। ঐ বুঝি দেখা যায় লক্ষ্য—দূরে—বহুদূরে। পিয়েরীর মনে হচ্ছে তাঁর বয়স বুঝি ঝরে গেছে। আবার সেই প্রখর যৌবন—আবার সেই মনের উত্তালতা।

কে জানে জীবনের প্রধান লক্ষ্যের শেষে এসে কি মনে হয়। কে বিচার করবে সেই জয়ের—সেই সমাপ্তির আনন্দ। হয়ত বা মনের মধ্যে দুঃখও ছাপিয়ে ওঠে। হয়ত বা জেগে ওঠে কত বেদনাময় স্মৃতি—কত জন, কত আশা, জীবনের কত বহু আকাঙ্ক্ষিত বসন্ত।

সামনে এবার চড়াই উৎরাই শেষ হয়ে গেছে। সামনে এবারে দূর—বহুদূর পর্য্যন্ত অসীম সমতল বরফের দেশ। কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই, নেই প্রাণের স্পন্দন। দিকচক্রবালে গিয়ে ঠেকেছে এই অসীম সমতলতা দৃষ্টি আর কোথাও বাধা পায় না। পথে বিশেষ কোন আর বিপদ ঘটেনি। মাঝে একবার হঠাৎ সামনে এক কালো জলের নদী লাফিয়ে জেগে বাধা দিতে চেয়েছিল কিন্তু বরফের

ভেলাতেই সকলে পার হয়ে গেল সেই বাধা। তখন সূর্য্যের সাথে সাথে মড়ার মত মুখ করে সাদা চাঁদ আকাশে ঘুরে মরছে। সূর্য্যের প্রখর আলো হরণ করে নিয়েছে তার সব দীপ্তি তবু এই মৃত্যু-পাণ্ডুর হিমের দেশে স্মরণ করিয়ে দেয় ওই চাঁদ প্রিয়জন সন্নিবিষ্ট কোলাহলময় ব্যস্ত জন্মভূমি। অপেক্ষারত স্ত্রী-পুত্র বন্ধু, জ্ঞানোন্মুখ জগৎ।

৫ই এপ্রিল পিয়েরী সকলকে একটু ভাল করে জিরিয়ে নিতে দিলেন। তখন তাঁরা ৮৯ ডিগ্রি ২৫ মিনিট ল্যাটিচিউড্ পার হয়েছেন। আর ৩৫ মাইল দূরে মেরু—৯০ ডিগ্রির সীমানা।

৬ই এপ্রিল—৮৯ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট।

সামনেই সুমেরু—মহা উত্তর দেশে পৃথিবীর যে স্থান মাত্র স্থির।

সামনেই লক্ষ্য অথচ এইখানেই যেন সমস্ত যাত্রার ক্লান্তি এসে ভর দিল পিয়েরীর দেহে। অনবরত ছুটে চলা, ক্লান্তিহীন, অবিরাম কত বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি সব যেন এবার নেমে আসতে চায় তাঁর চোখে। পথের সমস্ত বিপদ, সমস্ত উৎসাহ, নিরুৎসাহ যেন চোখের সামনে ভাসছে। মন উত্তাল তরঙ্গময়।

কিছুক্ষণ পিয়েরী ঘুমিয়ে নিলেন।

ওদিকে সকলেই তৈরী আছে। এমন কি এস্কিমোরাও যেন বুঝতে পেরেছে লক্ষ্য সামনে, সকলেরই উত্তেজিত ভা

কিছুক্ষণ পরেই ৬ই এপ্রিল—সন্ধ্যা দুটায় তাঁরা সদলবলে মেরুর

উপরে এসে দাঁড়ালেন। তিন শতাব্দীর কাম্য, লক্ষ্য—মেরু, মেরু, অবশেষে মেরু! সত্যি সত্যি কি? এত সহজে এ যেন বিশ্বাস হয় না। হল জয়? পিয়েরীর মন তখন দুলছে। যাক গবেষণা করে মাপজোপ নিয়ে পিয়েরী দেখলেন যে তাঁরা মেরু ছাড়িয়ে এসেছেন। কি আশ্চর্য্য অল্প কয়েক ঘণ্টার পথ চলায় পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্দ্ধ থেকে তাঁরা পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে চলে গেছেন! দুদিকেই অগাধ বিস্ময়! কত কত পর্ব্বত, বন, কন্দার গুহ-ময় রহস্যাবৃত পৃথিবী!

সেদিন তিনি তার উত্তরতম ক্যাম্পে ফিরে এলেন। পরদিন আবার যন্ত্রপাতি নিয়ে দশ মাইল করে সমস্ত দিকেই ঘুরে এলেন পাছে গণনায় কিছু ভুলের জন্য মেরুর ওপর না দাঁড়ান হয়।

তারপর পৃথিবীর উত্তর মেরুতে পৎপৎ করে উড়ল আমেরিকার জাতীয় পতাকা। সদলবলে পিয়েরী পতাকাকে সম্মান দেখালেন। দিক্‌চক্রবালে চলন্ত সূর্য্য অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রইল। ছ' মাস পরে চিররাতের সময় ঠিক মাথার ওপর ধ্রুবতারা চোখ মেলে একদিন দেখবে ঠিক নীচে মানুষের পদচিহ্ন! ধ্রুবতারা মানুষের স্মৃতি দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে, হয়ত মুহূর্ত্তের জন্য চিক্‌মিক্ করতেও ভুলে যাবে—অনধিগম্য মৃত্যুর দেশে জীবনের চিহ্ন এও কি সম্ভব?

তারপর পিয়েরী বরফের গোটাকতক চাঁইয়ের মধ্যে একটা বোতলে করে তাঁর চিহ্ন—তাঁর লিখন রেখে গেলেন :—

"কেপ্ কলাম্বিয়া থেকে ২৪শে মার্চ্চ মেরু পৌছলাম। সঙ্গে পাঁচজন লোক, পাঁচটা শ্লেজ আর আটত্রিশটা কুকুর।

পৃথিবীর এই উত্তর মেরুতে আমি আমেরিকার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আশপাশের সমস্ত দেশ আমেরিকার নামে অধিকৃত করলাম।

আমেরিকার পতাকা এখানে আমেরিকার প্রতিনিধি হয়ে রইল।"

—রবার্ট পিয়েরী।

সমস্ত মন তখন যেন শান্ত হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে জয়। শেষ হয়ে গেছে জীবনের কর্ম্ম—বিজ্ঞান-জগৎ পেল মহৎ দান। সৃষ্টির আনন্দে, জ্ঞানের আনন্দে, আবিষ্কারের আনন্দে মন ভরপূর, তবু যেন কোথায় আসে বেদনা। জীবনের কাজের শেষের বেদনা—বিদায়ের বেদনা। ফিরে যেতে হবে এবার। জীবনের এতগুলো বছর এত উৎসাহ এত ধৈর্য্য যার পেছনে খরচ হল সেই লক্ষ্যের কাছে এবার বিদায়।

৭ই এপ্রিল উত্তর মেরুর কাছে পিয়েরী বিদায় নিলেন। পৃথিবীর শিখরে দাঁড়ান তাঁর শেষ। এবার দক্ষিণে তাঁর কাজ। সামনে

এখনও দীর্ঘ চারশো তেরো মাইল পায়ে হাঁটা পথ পড়ে আছে—পড়ে আছে হয়ত অগণিত বিপদ।

একবার শেষ দৃষ্টি পিয়েরী ফিরে দিলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্যের দিকে—ধীরে ধীরে পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে তা। অতীতের কবলে চলে গেল ওরা—এবার ভবিষ্যৎ সামনে। ভবিষ্যৎ আর আশা।

ফেরার কাহিনী আর বর্ণনা করব না। সেই অভিজ্ঞতা সেই সব। শুধু বিপদ অনেক কম ছিল। তৈরী পথ ছিল বলে তাঁরা যাওয়ার চেয়ে অনেক শীঘ্রই ফিরেছিলেন। সকলেই সুস্থ কর্ম্মক্ষম সবল।

মেরু-সমুদ্র পার হয়ে যখন তাঁরা স্থলের বরফে পা দিলেন, এস্কিমোরা আনন্দে ক্ষেপে গেল। তারা নাচতে লাফাতে সুরু করল—আনন্দে কি যে করবে তারা ভেবে পায় না। শেষে একজন এস্কিমো বললে যে—সয়তান নিশ্চয়ই ঘুমচ্ছে কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছে—না হলে আমরা এত সহজে ফিরে আসতে পারতাম না।

২৩শে এপ্রিল কেপ্ কলাম্বিয়া।

তার দুদিন পরে পরিচিত, অতি পরিচিত, প্রিয়—প্রিয়তম জাহাজ রুজ্ভেল্ট্ দেখা দিল। সে কি অনুভূতির তরঙ্গ।

জাহাজ থেকে দলপতিকে দেখে দলের সমস্ত লোক নাবিকেরা সমস্বরে আনন্দ ধ্বনি করে উঠল।

কিন্তু এইখানে অপেক্ষা করেছিল তিক্ত দুঃসংবাদ যা শুনে পিয়েরীর চোখে সমস্ত জগৎ কালো হয়ে গেল। আগু বাড়িয়ে নিতে এসে বার্টলেট্ বললেন—মারভিনের খবর শুনেছেন?

—না, কি হয়েছে ?

—পথে জলে ডুবে মারা গেছেন তিনি।

পিয়েরীর মনে হল তাঁর সমস্ত জয় সমস্ত শক্তি আজ ব্যর্থ। তাঁর ডান হাতটা কে মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। মার্‌ভিনের এস্কিমোরা এগিয়ে গিয়েছিল। তিনি পিছনে আসছিলেন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে করতে। সেখানে তখন অনবরত বরফ ভেঙ্গে কালো জলের সৃষ্টি হচ্ছিল। মার্‌ভিনের চীৎকার কেউ শুনতে পায়নি। তাঁর কি হল কেউ জানে না। যে লোক নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃসঙ্গ কাজকে ডরাত না, নিঃসঙ্গ মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করে নিল।

এইবার আবার সভ্যজগৎ। এস্কিমোদের কাছে পিয়েরী বিদায় নিলেন। এই সহজ অনাড়ম্বর সরল জাত তাঁকে পিতার মত ভালবেসেছিল। এদের সঙ্গে তাঁর জীবনের সূত্র বছরের পর বছর ধরে গ্রন্থিত। আজ তাদের কাছে বিদায় নিতে মনে যেন জেগে উঠে কত বেদনা—জীবনের অতীত বসন্তের স্মৃতি প্রাণময় হয়ে ফিরে আসে। পিয়েরী যোগ্যতা অনুসারে এস্কিমোদের অনেক উপহার দিয়ে গেলেন। বন্দুক, ছুরী, ছোরা নানা দরকারী জিনিস—জমানো খাদ্য। এস্কিমোরা টাকার মূল্য বোঝে না। এই সবই তাদের মহামূল্য সম্পত্তি ; তারা এক একজন ধনী হয়ে গেল এস্কিমো মহলে।

ফিরে চলল রুজ্‌ভেল্ট। সমগ্র জগৎ সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে বিজয়ী বীরের।

শেষ। বিরাট মানবের কর্ম্মক্ষেত্রে বিরাট প্রাণের স্পন্দন স্পন্দিত হয়ে যায় যুগে যুগে। মৃত্যুহীন, জ্ঞানকামী বীরেরা আজও তাকিয়ে থাকে কোন মহাশূন্য হতে প্রিয় এই পৃথিবীর দিকে। জ্ঞানভাণ্ডারে জ্ঞান বাড়ছে। পৃথিবীর মানুষ চিরকৃতজ্ঞ তাদের কাছে—যারা অদম্য উৎসাহে প্রাণ তুচ্ছ করে জ্ঞানের পথে প্রথম পা দিয়েছে। ঊষা-লোকের নবীন উৎসাহে উজ্জীবিত করেছে অন্ধকারময় মানুষের মন। পৃথিবীর শিশুরা আজ সেই পথে পদার্পণ করে ধন্য-সমুৎসাহিত !

-শেষ-